গ্রেটার বিঙহ্যামটন বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের

সবিনয় নিবেদন

শারদ অর্ঘ্য

শারদীয়া ১৪১৫

The Cultaral Magazine

of

Greater Binghamton Bengali Association

Binghamton, New York

2008

Greater Binghamton Bengali Asociation

Would like to thank the following members without whose dedication and contribution Sarbojonin Durgotsav 2008 would never be possible.

Committee	*Participating Members*
Pratima	Abhijit Banerjee, Biplab Roy, Sambit Saha & Anju Sharma
Worship	Bhaswati Biswas, Deepa Purkayastha, Bharati Ghosh, Anirudhdha Banerjee, Biplab Roy & Debolina Ray .
Decoration	Biplab Roy, Debolina Ray, Abhijit Banerjee, Dwaipayan Sen, Sweta Bhattacharya, Esha Sinha, Sambit Saha, Anju Sharma, & Anika Kumbhakar
Cultural	Arindam Purakyastha, Dwaipayan Sen, Sweta Bhattacharya, Deepa Purakyastha, Biman Roy, Parveen & Biru Paksha Paul, Biplab Roy & Debolina Ray. Kids' Program, Sit & Draw, Science For Fun: Sheema Roychowdhury
Food & Culinary	Dinner Arrangements : Samir Biswas Cooking: Bhaswati Biswas, Deepa Purkayastha, Sanjukta Das, Esha Si nha, Subal Kumbhakar, Anasua Datta, Pradipta Chatterjee, Sudipta Chatterjee & Sudeshna Ray
Website & logo	Debolina Ray & Biplab Roy
Sharad Arghya Team	Cover-page Creation, Editorial Work & Interior Arrangements: Biplab Roy Compilation: Biplab Roy, Debolina Ray & Abhijit Banerjee Publishing: Biplab Roy & Abhijit Banerjee Message from the Board: Samir Biswas
Budgeting & Finance	Pranab Datta, Sumit Ray, Samir Biswas & Abhijit Banerjee
Sound, Light & Stage	Pranab Datta, Arindam Purkayastha & Bijoy Datta
Hall Arrangements	Sudeshna Ray & Pranab Datta
Overall Management	Pranab Datta, Samir Biswas, Abhijit Banerjee & Biplab Roy

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Pratima Artisan: ***Dev Exports, Kolkata, West Bengal, India***

Message from the Board

Dear Friends:

Our community's first Durga Puja is here. It seems like just the other day, when two enthusiastic students from Binghamton University, Biplab Roy and Abhijit Banerjee, proposed to the community if we could support them in organizing first ever Durga Puja celebration in the greater Binghamton area. With community support and relentless effort by many volunteers, that special day is around the corner.

While we are sure that we have not been able to meet all the expectations, but certainly this is a modest beginning. In years to come, we expect that this small beginning would grow into a big promise with commitment from many other individuals in the community.

On this special occasion we have also made an effort to bring out this magazine as a part of art and cultural tradition of the Bengali community. We sincerely invite you all to share the joy and happiness of this festive time and make this Durga Puja celebration a successful event.

On behalf of the Greater Binghamton Bengali Association Durga Puja committee we would like to extend our warm Sharodiya greetings and best wishes to all of you.

Sincerely,

2008 Binghmton Sarbojonin Durgotsav Committee
Greater Binghamton Bengali Association

Editorial

Creativity is ingrained in the core of Bengali minds. Bengalis are known for their love towards language, literature, fine arts etc. Be it a marriage or a Puja, We have a long tradition of writing poems, publishing souvenir magazines. 'Sharad Arghya' is a continuation of that tradition, saluting poetic Bengali minds and their sense of aesthetics. It is a combined effort of Bengalis in the Greater Binghamton area and their relatives, acquaintances from all over the world.

Publishing magazine (be it a print or a webzine) is a difficult work anywhere in the world. In a location, thousands of miles away from Bengal, it is even more difficult to publish articles in Bengali with limited monetary and intellectual resources. The magazine committee of Binghamton Sarbojonin Durgotsav 2008 has put up an extravagant effort to publish a perfect magazine. The committee is made up of young people who do not have much experience of publishing. Considering this as our first effort, I apologize for any unwanted and unnoticed mistakes.

We may be small but certainly not insignificant- Greater Binghamton Bengali Association strongly believes in this. The idea of arranging a mammoth event like Durga Puja, initiated and carried out by a few Bengali students of Binghamton University and supported by the small population of local Bengali residents is a bold manifestation of that belief. Starting with handful of supportive minds and ocean of odds, it has already been emerged as the biggest Bengali event in the surrounding areas, even before its first occurrence. We are gladly receiving guests from nearby Syracuse, New Jersey, and even from far Atlanta. 'Sharad Arghya' which is an integral part of Binghamton Sarbojonin Durgotsav follows the same belief. This magazine, has aimed to conjure creativity of local Bengalis as well as their relatives. I appreciate the enthusiasm and participation they have shown to make our publication a success.

Durga Puja is not only a religious event, it also invokes nostalgia in the people who do not get frequent chance to go back home to be a part of the greatest festival of Bengal. Greater Binghamton Bengali Association is trying to give you back the glimpses of the memories that you cherish at the back of your mind. In this effort, apart from the hard work of Magazine Committee, I would like to take a chance to admire the restless endeavor of Idol Committee, Worship Committee, Decoration Committee, Food Committee and Cultural Committee who have functioned closely to make the whole event as authentic and as Bengali as possible.

At the end, I would like to thank you all for your kind patronage without which the event would never be possible. I hope all of you will enjoy 'Sharad Arghya', the Puja and a day with us. Magazine Committee is open for your comments because we believe it is a process of learning. Wish you all a happy 'Sharodiya' and 'Subho Bijoya'.

Biplab Roy, on behalf of ***Sharad Arghya Team***

প্রবন্ধ

বিঙহ্যামটনে মাতৃবন্দনা

মনীষ চট্টোপাধ্যায়

ঊর্দ্ধতন নিউ ইয়র্ক রাজ্যের IBM আর Spiediefest প্রসিদ্ধ বিঙহ্যামটন শহরের নানা রূপ। নানা সজ্জা, নানা মহিমায় সে উদ্ভাসিত। চতুর্দিকে তাকে বেষ্টন করে রয়েছে সুউচ্চ Catskill (বিড়ালমারি, না কি চৌকস বিড়াল?) পর্ব্বতপুঞ্জ। তার মধ্যদেশ দিয়ে সর্পিল গতিতে প্রবহমান বিখ্যাত Susquehanna নদী, Otsego Lakeর থেকে যার উৎপত্তি, আর ছয় শতাধিক মাইল অতিক্রম করে যে Chesapeake Bay তে গিয়ে গয়া-প্রাপ্ত হয়েছে। যার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বিখ্যাত ইথাকা শহর। আইভি-গুল্মে আবৃত আমেরিকার উচ্চবর্ণের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কর্নেল ইউনিভার্সিটি যার নিজস্ব মহিমময় SUNY বিশ্ববিদ্যালয়কে বহিরাগতের দৃষ্টিতে করেছে খানিকটা নিষ্প্রভঃ। আমরা জানি যে অধিকাংশ বহিরাগতরা বলে থাকেন যে তাঁরা বিঙহ্যামটন শহর পার হয়ে থাকেন ইথাকা অথবা রচেস্টার, গন্তব্যভেদে নিউ ইয়র্ক শহর অথবা লঙ আইল্যান্ড যাওয়ার পথে। নিতান্তই ক্ষোভের বিষয় যে এইরূপ বিঙহ্যামটন-নিস্পৃহের দলে রয়েছেন টরোন্টো ও অন্যান্য আমেরিকা-র প্রতি ঈর্ষা-জর্জ্জরিত কানাডা-নিবাসী নাগরিককুল। এই সমস্ত স্বল্পশিক্ষিত বহির্নিবাসী অজ্ঞ প্রাণীর মূঢ়তার জন্য বিঙহ্যামটন নিবাসী ভদ্রসমাজ আদৌ বিব্রত ন'ন। তাঁরা জানেন যে ইথাকাতে চাইলেও Spiedie খুঁজে পাবে নাকো তুমি। রচেস্টারে প্রতি আগস্ট মাসে আকাশ জুড়ে তপ্ত বায়ু উত্থিত বেলুনের শোভা দেখা যাবে না। আর অন্য কোন পড়শী স্থানীয় শহর ঘোরতম, শীতলতম শীতের গৃহবন্দীদশার চূড়ান্ত লাঞ্ছনার মধ্যে বিঙহ্যামটন-বাসীদের মত অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখতে পারবে না ৫০ অথবা ১০০ বছরের রেকর্ড ভাঙার গৌরবের আঙিনায়। মানছি যে, এই বিতর্কিত বিষয়ে বিঙহ্যামটনের উত্তরে অবস্থিত সিরাকিউস শহর সম্ভবতঃ দম্ভের কাঠিতে ঊর্দ্ধতর। তথাপি, সিরাকিউস কি পারে টমাস ওয়াটসনের জনস্থানের বড়াই করতে, না কি সে পারে Susquehanna নদীর উপত্যকার আদরিনী ললনা হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করতে? বিঙহ্যামটন শহরের মহিমা বিস্তারে আজ চার দশকের অধিককাল জুড়ে আনন্দ-সহকারে নিয়োজিত রয়েছেন তার নানা তারকা-উজ্জ্বল বাঙালী সমাজ। সংখ্যার মাপকাঠিতে তাঁদের বিশাল আখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্তু উচ্ছাস, উদ্দীপনা, উৎসব-মুখরতায় তাঁরা অন্য কোন সংখ্যা-গরিষ্ঠের চাইতে এতটুকুও কম যান না। এই বিঙহ্যামটন শহরে কিছুদিন আগেই অধুনা নিউ জার্সি প্রবাসী এক কৃষ্টিপ্রেমিকযুগল সুদূর কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের সংগ্রামী শিল্পী পিযূষকান্তি সরকারকে তাঁর কণ্ঠের জাদু বিস্তার করার ঠাঁই করে দিয়েছিলেন । এই বিঙহ্যামটন শহরের প্রাক্তন নিবাসী ডাক্তার-প্রবর কুমার দাস উত্তরপূর্ব ভারতের অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয় অঞ্চলে জনসেবার নিরিখে আজ প্রবাদপ্রতিম। বিশেষ করে এটাও বলা প্রয়োজন যে উত্তর আমেরিকার যেখানেই কিছু বঙ্গীয় উৎসব ঘটে থাকে, সেখানে প্রায় মুদিত নয়নে ধরে নেওয়া চলে যে একাধিক বিঙহ্যামটন-বাসী বাঙালী সেই উৎসবে সামিল হবেনই। এসব ছাড়াও বাঙালীর প্রিয় সরস্বতীপূজা, তার নববর্ষ উৎসব, বাৎসরিক বনভোজন, শারদীয়া প্রীতিসমাবেশ - এমন আরও কত বর্ণাঢ্য উৎসব এখানে সারা বছর লেগে থাকে।

শুধু জনবলের অনাধিক্যের কারণে উদ্দীপনাময় বিঙহ্যামটন শহরে এতদিন বাঙালীর সর্বাধিক প্রিয়তম উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা পূর্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নি। দুর্গাপূজা সমূহ সংগঠন আর অপার অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের উৎসব। বহু বাঙালী একত্র হয়েও community level এই দূর্গোৎসব উদ্‌যাপন করতে সাহসী হ'ন না।

এ হেন বিঙহ্যামটন শহরে, শোনা যাচ্ছে, কয়েকজন নব্য যুবার অধীর আগ্রহে, জগজ্জননী দূর্গার আবাহন আর পূজনের আয়োজন করা হচ্ছে এই ১৪১৫ বঙ্গাব্দে। এই নবযুবাদের অসীম সাহসের আমরা অকুণ্ঠ প্রশংসা করি। তাদের এই সৎ-প্রয়াশের সার্থকতা, বলাই বাহুল্য, নির্ভর করছে বিঙহ্যামটন আর তার নিকটবর্তী নানা শহর আর নগরবাসীদের আগ্রহ আর সহায়তার ওপর। তাই আমাদের বিশেষ আমন্ত্রণ Corning, Sayre, Ithaca, Syracuse, Rome, Oneonta আর বহুবিধ শহর আর শহরতলীবাসীদের প্রতি। আপনারা বিঙহ্যামটনের এই অসামান্য প্রচেষ্টায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন; যোগদানের প্রতিশ্রুতি রাখুন। মহামায়ার পূজা যাতে যথাযোগ্য মর্যাদা আর সমারোহের সাথে উদ্‌যাপিত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আপনারা এগিয়ে আসুন। সকলের সম্মিলীত চেষ্টায় বিঙহ্যামটনের গঙ্গাতীরে (মতান্তরে Susquehanna নদীতীরে) শরৎ আর শারদোৎসব এবার নতুন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোক।

Composition

Durga Puja in the Life of Bengali Hindus

Biru Paksha Paul

Why are Bengalis so passionate about celebrating Durga Puja? Why is Durga Puja the greatest religious festival among Bengali Hindus? If we were to discuss the answers to these questions thoroughly, we would probably end up writing a book. Instead, this writing intends to touch only a few vital points in regards to the popularity of Durga Puja among Bengali Hindus.

The historical origin of Durga Puja goes back to the age of Rama Chandra. While fighting with Ravana, who was favored by the goddess Durga, Rama found it difficult to win the war. It was clear to Rama that Ravana would remain invincible as long as Devi Durga continued to protect her devotee, Ravana. Hence, Rama decided to worship the goddess Durga in order to win her favor. Pleased by the devotion and rationality of Rama, Durga gave Rama the power to win the war against Ravana. Since then, worshiping Durga has become a symbol of recovering from distress and sufferings of all sorts.

Bengali Hindus liked this symbol more than any other races in India. As Bengalis are generally introverted, they become easily fragile in the face of adversities. They find a better peace of mind in worshiping such a spiritual power as Durga, who is specialized in protecting her disciples and eradicating all sufferings from their lives. The name 'Durga' originates from the word 'Durgati' which means distress, sufferings, or misery. Durga is believed to destroy all these dangers and afflictions in the lives of her devotees.

Although Bengali Hindus did not belong to a matrimonial society, the 'mother,' which they call 'Ma' occupies a central and emotional place in their psychology. While the 'father' symbolizes financial security, the 'mother' signifies a lovely and meaningful existence in life. Ma is the symbol of attachment, care, the deepest feeling along with respect, emotion, and what not! Hence, worshiping a power in the integument of 'Ma' gives a special enrichment to the hearts of Bengali Hindus. This autumn festival in celebration of Durga Puja enables Bengalis to arrange family reunions and revitalize family ties in a joyful way within their cultural milieu. The devotees feel a sense of security, love, and virtue in the rituals of Durga Puja. The great goddess symbolizes strength and motherhood in a unique way to her followers. That is why Bengali Hindus are so passionate about celebrating Durga.

ভ্রমণ

নিসর্গে ভরা উত্তর পশ্চিম আমেরিকা

ভাস্বতী বিশ্বাস

ভ্রমণপিপাসু বাঙালী বেড়াতে চিরকালই ভালোবাসে। কিন্তু প্রতিবছরের মত বেড়ানো আমাদের সেবছর স্থির হয়নি। সাল ২০০৬। আমেরিকার গ্রীষ্ম শেষ হওয়ার মুখে। কোথাও যাওয়া স্থির হচ্ছে না বলে আসন্ন শীতে আবার ঘরবন্দী হতে হবে ভেবেই মনটা বিষন্ন হয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে আমার ভাইঝি সদ্য দেশ থেকে সিএটল মাইক্রোসফটে চাকরি নিয়ে এসেছে। প্রবাসে, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে এসে একাকীত্বের গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বহুবার পিসিকে বেড়িয়ে যাবার আমন্ত্রণ ফোনে জানিয়েছে। শেষে কোথাও না যাওয়ায় আগস্টের শেষে সিএটল যাওয়া স্থির হ'ল। ভাইঝি তো সুখবর পেয়ে আত্মহারা, কিন্তু মাত্র চার দিনের জন্য শুনে আনন্দটা দমে গেল।তবুও চারদিনের আনন্দ কম কিসের!

চলে গেলাম ভেট্টয়েট হয়ে সিএটল আমার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে।আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সম্ভার।সিএটলকে বলা হয়ে 'এমারেল্ড সিটি', তার সহস্র পার্কের জন্য। শহরটির পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, অন্য দিকে ক্যাসকেড পর্বতমালা।

প্রথম দিনই ভাইঝি আমাদের নিয়ে গেল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান-স্পেস নীডল সেন্টার। ১৯৬২ সালে তৈরী এই টাওয়ারে ৮৪৮ সিড়ি বেসমেন্টের নীচে থেকে অবজারভেশন ডেকের উপর পর্যন্ত। টাওয়ারের নীচে স্যুভেনীরের দোকান, পর্যটনের অফিস ইত্যাদি। এলিভেটরে চড়ে অবজার্ভেশন ডেকে পৌছালাম যার গতি প্রতি মিনিটে ৮০০ ফুট।উপরে একটি সুন্দর রিভলভিং রেস্তোরা আছে। সারা সিএটল সন্ধ্যের অন্ধকারে আলোয় ঝলমল করছে। দুরে দক্ষিণে উকিঁ দিচ্ছে মাউন্ট রেনিয়রের তুষারশৃঙ্গ, পূর্বে ক্যাসকেড পর্বতমালা আর দুরে পশ্চিমে রাজসিক অলিম্পিক পাহাড়। অন্যদিকে বড় জাহাজ, ফেরি আর ক্রুজলাইনের মাথা দেখা যাচ্ছে এলিয়টের জলে। অসম্ভব ভালো লাগছিল সারা শহরটা এই উচ্চতা থেকে দেখতে।

Space needle

সিএটলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনেকগুলো ন্যাশনাল পার্ক আছে। মাউন্ট রেনিয়র, অলিম্পিক ন্যাশনাল পার্ক, নর্থ ক্যাসকেডস ছাড়াও বিখ্যাত মাউন্ট সেন্ট হেলেন ভল্ক্যানিক মন্যুমেন্ট। স্থির হল আমরা মাউন্ট রেনিয়র ন্যাশনাল পার্কে যাব।তার জন্যে চাই সুন্দর দিন। মেঘলা কুয়াশাভরা আকাশ হলে নাকি দুর্ভাগ্য, তাহলে পার্কে গিয়ে সাদা চাদরে মোড়া আস্তরণ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যাক, সূর্যমামা সহায় ছিলেন, দিন্ট একেবারে সোনালি রৌদ্রে ঝরানো ছিল। রওনা হলাম মাউন্ট রেনিয়রের অভিমুখে। তিনঘন্টায় এসে পৌছলাম সেই আকাঙ্খিত জায়গায়। পার্কের গেট পেরিয়ে ঘন জঙ্গলের মাঝখানে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় গাড়িতে উপরে উঠতে লাগলাম। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। অবাধ সবুজ অরণ্য আর ছোটো পাহাড়ি নদী আর ঝর্না পেরিয়ে ৬০০০ ফুট উচ্চতায় পৌছলাম। পরিস্কার নীল আকাশের পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে বরফে ঢাকা শুভ্র মাউন্ট রেনিয়র।আরো কিছুটা গিরিপথ অতিক্রম করে থামলাম Reflection Lake-র সামনে। শুভ্র রেনিয়রের চূড়ার প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ হ্রদে। এই জন্যেই নাম 'Reflection Lake'। মনকে ভরিয়ে তোলার মতো সুন্দর একট শান্ত পরিবেশ। Lakeঅবশেষে পৌছলাম প্যারাডাইস ট্যুরিস্ট সেন্টরে।এখান থেকে মাউন্ট রেনিয়রকে খুব কাছেই মনে হচ্ছে।মাউন্ট রেনিয়র ক্যাসকেড পর্বতমালার সবচেয়ে উচ্চতম শৃঙ্গ, উচ্চতায় ১৪,৪১০ ফুট এবং অসংখ্য হিমবাহ আর তুষারস্রোতে ঢাকা।যার মধ্যে Carbon Glacierটি ঘনত্বে এবং Emmons Glacierটি আয়তনে সবচেয়ে বড় আমেরিকাতে।

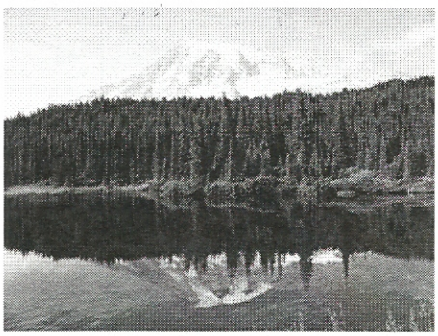

Reflection Lake

মাউন্ট রেনিয়র

এই জায়গাটা যথার্থই প্যারাডাইস, সরু গিরিপথে বহু পর্যটক হাইকিং এ চলেছে, নানা পাহাড়ি ফুলে ঢাকা নীচের উপত্যকা, তারই মাঝে দুটো হরিণ দেখা গেল। শান্ত শুভ্র এই হিমবাহে ঢাকা ধুসর পাহাড়ের এক নৈসর্গিক অপরুপ সৌন্দর্য্য চোখের সামনে ফুটে উঠল। সারাদিন মাউন্ট রেনিয়র পার্কে কাটিয়ে পরেরদিনটা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ক্রুজে কাটালাম।

ওয়াশিংটন স্টেট আর কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া রাজ্য গা লাগানো। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রাজধানী ভিক্টোরিয়া জলপথে সিএটল থেকে মাত্র চারঘন্টার দুরত্ব। তাই একদিনের জন্যে ফেরি নিয়ে হাজির হলাম ভিক্টোরিয়াতে। ডকেই দাড়িয়ে ছিল লাল রঙের দোতলা ট্যুর বাস। শহরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থানে নিয়ে গেল পর্যটকদের। ফার্স্ট ন্যাশনের তৈরী টোটেম পোল নানা ধরণের ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্য এবং ব্রিটিশ রাজত্বের ছোয়ায় দুপুরের ইংলিশ টী পার্লারের সাথে ইউনিভার্সিটি অফ ভিক্টোরিয়ার সংমিশ্রণে- খুবই প্রাণবন্ত শহর ভিক্টোরিয়া। প্রথম দিনেই ঐতিহাসিক ফেয়ারমন্ট হোটেল, পার্লামেন্ট, চায়না টাউন, রয়্যাল বিসি মিউজিয়াম দেখে পরেরদিন গেলাম বুসার্ট গার্ডেন এ। ৫৫ একর জমিতে তৈরী এই বাগানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ফুলে, গাছে ভরা। ১৯০৪ সালে জেনি বুসার্ট তার স্বামীর quarry সাইটে বাগানটি সুরু করেছিলেন। আজও ১০০ বছর পরে সেই আদর ও যত্নে বাগানটি বিস্তারিত হয়ে পুরানো ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। বাগানটি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত - তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জেনি বুসার্টের নিজের হাতে তৈরী Sunken Garden, Rose Garden এবং Japanese Garden. কি সমৃদ্ধ ফুলের বাহার, যে দিকে তাকানো যায় শুধু নানা রঙের রামধনু, তারই মাঝে ছোট ছোট জলপ্রপাত, ছোট বাঁশের সেতু, কোথাও বা কাঠের কারুকার্য করা বিভিন্ন আকারের টোটেম পোল। আরো অবাক হলাম আমাদের দেশের দোপাটি ফুল আবিস্কার হওয়ায়। এত মনোরম আর স্নিগ্ধ জায়গা ছেড়ে মন চায়না চলে আস্তে, তবুও ওখানেই লাঞ্চ সেরে, বিকেলে এলাম ভিক্টোরিয়ায় হারবার ফ্রন্টে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকের সমাগমে, সন্ধের আলোতে গান-বাজনা, দোকানে দোকানে জায়গাটি কোলাহলে সরগরম। পাশেই Under the Sea Museum - সমুদ্রের নিচে গিয়ে নানান সামুদ্রিক প্রাণী দেখা যায়। সবকিছু দেখার পরে, পরেরদিন ফিরলাম সিএটলে।

বুসার্ট গার্ডেন

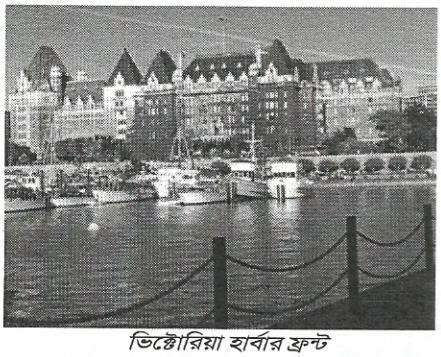

ভিক্টোরিয়া হার্বার ফ্রন্ট

আর মাত্র একটা দিন। ভাগ্নী আমাদের জন্যে মাউন্ট সেন্ট হেলেন ভল্ক্যানিক মন্যুমেন্টে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু হঠাৎ আবিস্কার হল ক্যাসকেড পর্বতে একটি সুন্দর ব্যাভেরিয়ান শহর- লিভেনওয়ার্থ (Leavenworth)। চললাম সেই অভিমুখেই। সারা ক্যাসকেড পর্বতের রাস্তাটা অপরুপ সুন্দর। চার হাজার ফুট উপরে উঠে- বিখ্যাত স্টিভেন্স পাস পেরিয়ে যখন লিভেনওয়ার্থ পৌছলাম, মনে হল যেন ব্যাভেরিয়ান আল্পসে পা দিয়েছি। চতুর্দিকে জার্মান সংস্কৃতির স্পর্শ- শুধু সবাই ইংরিজিতে কথা বলে। অথচ এক যুগ আগে, ইয়াকিমা, চিন্যুক এবং ওয়েনাচি- গোষ্টির রেড ইন্ডিয়ানদের বসবাস ছিল।

লিভেনওয়ার্থ

বর্তমানে জায়গাটি শীতের স্পোর্টসের জন্যে বিখ্যাত। অক্টোবরে জার্মান উৎসব 'Octoberfest' হয় এখানে। চারিপাশে ঘেরা পাহাড়, ফুলে ফুলে ঢাকা রাস্তার দুদিক, ছোট্ট সব দোকানে জার্মান বীয়ার আর চকোলেট বিক্রি হচ্ছে। জার্মান রেস্তোরা আর পাবে ভরা লিভেনওয়ার্থ, প্যাসিফিকের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের একটি প্রাণচঞ্চল জার্মান শহর। দুপুরে একটা জার্মান রেস্তোঁরায় খেয়েই রওনা হলাম Wenatchee পার্কের নদীর ধারে নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে। সবাই দেখি দ্বিপ্রহরে আরাম করছে টিউবিং এ অথবা বোটিংয়ে, আবার অনেকে মাছ ধরতে ব্যস্ত। আমরাও পাথরে আছড়ে পড়া Wenatchee নদীর জলে কিছুক্ষণের জন্যে নামলাম শীতল হওয়ার জন্য। তারপর শহরের মধ্যে Nutcracker Museum, মে পোল সব দেখে রাত্রে ফিরে এলাম। সব মিলিয়ে এ যেন ছিল নিসর্গ।

কিন্তু এবার ফেরার পালা। কটা দিন অভ্যস্ত জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে যা দর্শন করলাম তা অনেকদিন মনে থাকবে। আমেরিকার উত্তর পশ্চিমের অশেষ সৌন্দর্যের সম্ভার আমার পর্যটক মনকে এত আকৃষ্ঠ করেছে যে আবার যাওয়ার ইচ্ছা রইল।

ছোটগল্প

পুজোয় মহাদেবের চিন্তা

খনা দেব

হিমালয় পর্ব্বতে শরতের আলো ঝলমলে এক নির্জন দুপুরে উদাস মনে মহাদেব বসেছেন গাঁজা হাতে নিয়ে, নানা রকম এলোমেলো চিন্তায় মনটা উঠেছে ভরে। ছেলেমেয়েরা কেউই বাড়ি নেই। অস্বাভাবিক নীরব হয়ে আছে চারদিক। সামনের বট গাছে একটা নাম না জানা পাখি অনেকক্ষন ধরে ডাকাডাকি করছে তার সাথিকে। নেশাটা বেশ ভালই জমেছে। পার্ব্বতী দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে করতে গান গাইছে। ভেতর থেকে তারই মিষ্টি সুর ভেসে আসছে।শরতকালে পার্ব্বতীকে যেন চেনাই যায় না। বাপের বাড়ি যাবার আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে, কথায় কথায় গান, কথায় কথায় হাসি। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতী ও যেন ঝলমল করে ওঠে। কিন্তু আসন্ন বিরহের আশায় মহাদেবের মনটা ছটফট করতে থাকে। খুট করে দরজা খোলার আওআজে চিন্তায় বাধা পড়লো। সুন্দর একটা শাড়ি পরে সেজেগুজে ঘরে ঢুকল পার্ব্বতী, - 'কি গো, চুপ করে বসে কি অতো ভাবছ? আমাকে এক্ষুনি একটু শপিঙে যেতে হবে। ছেলেমেয়েরা এলে বলো টেবিলে খাবার ঢাকা দেয়া আছে, গরম করে যেন খেয়ে নেয়। আমার ফিরতে দেরি হবে হয়তো।' এই বলে পার্ব্বতী বেরিয়ে গেল।

মহাদেব আবার ভাবতে বসলেন। এই এক ঝামেলা, বাপের বাড়ি যাবে, বাজারের যেন শেষ নেই। পারলে বোধহয় পুরো হিমালয় পাহারটাই নিয়ে যায়। এদিকে যা দিনকাল পড়েছে, একটু বুঝেশুনে না চল্লে কি হয়? অথচ কিছু বলতে গেলেই মুখ ভার। সব কিছু সহ্য হয় শুধু পার্ব্বতীর মুখে হাসি না দেখলে যেন ভালো লাগেনা। পার্ব্বতী ও সেটা ভালোভাবেই জানে আর সে সুজোগ নেয়। আগে মাত্র তিন দিন এর ব্যাপার ছিল, কষ্ট হলেও দেখতে দেখতে সময় কেটে যেত। কিন্ত এখন আবার ঢঙ হয়েছে, শুধু বাপের বাড়ি গিয়ে শান্তি নেই, পুজোর নামে বিলেত, আমেরিকায়ো যাওয়া চাই। কিছু বলতে গেলে ওমনি মুখ ঝামটা - 'ওরা অত করে ডাকে, না গিয়ে কি পারি? হাজার হোক ওরাও তো আমার নিজের লোক। বেচারারা এমনিতেই বিদেশে পড়ে আছে, দেশের পুজোর আনন্দে তো আর যোগ দিতে পারেনা; আমার ভারি কষ্ট হয়।' বোঝো ঠ্যালা, বিদেশে গিয়েছে তো নিজের ইচ্ছেয়। আমি কি বলেছি যেতে? কিন্তু এসব যুক্তি পার্ব্বতীকে দেখিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া এতে কমলা, ভারতী ও ইন্ধন যোগায়। হাজার হোক বিদেশের একটা মোহ আছে তো? গনশা অবশ্য এ'সব ব্যাপারে কিছু বলে না, কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্রও বিদেশ যাবার নামে এক পা বাড়িয়ে আছেন। বাবুর আবার সাজগোজের দিকে দারুন ঝোঁক। খরচার কথা ভেবে সেদিন পার্ব্বতী কে ব'লতে গিয়েছিলাম 'এবার কি বিদেশে না গেলে হয়না? দিনকালের যা অবস্থা, সব দিক সামলানো প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠেছে।' সেই শুনে পার্ব্বতী বল্লে - 'বাপরে বাপ, বছরে তো মাত্র একবারই যাই, তোমার যেন সেটাও সহ্য হয় না। আমি কি আর জানিনা দিনকাল যে খারাপ? সব ভেবে তাই বৃটিশ এয়ারে যাবার ব্যাবস্থা করেছি। ওটাতেই ভালো রিবেট পাওয়া যাচ্ছে এখন। তোমার কথা ভেবে বিলাসিতা তো প্রায় ছাড়তে বসেছি।' ঐ আর এক ঝামেলা - সব কিছু করবে অথচ মুখে বলবে 'সব কিছুই ছেড়েছি।' কথা বাড়ালেই কথা বাড়ে তাই চুপ করে গেলাম।বাইরে হংস রাজের আওয়াজ হল যেন, ভারতী বোধহয় বাড়ি ফিরলো। না, শুধু ভারতী নয়, দু'বোনই কলকল করতে করতে ঘরে ঢুকলো। আমার দিকে লক্ষ্যই নেই, কি সব কিনে এনেছে তাই দেখতেই ব্যস্ত।

'এই দিদি, দেখি তোর বিকিনিটা বার করতো, আমার তো মনে হচ্ছে ওটাতে তোকে ঠিক মানাবে না।'

'কে বল্লে তোকে? সেদিন নারায়ণ বলছিল, কালো রঙে নাকি আমাকে দারুন মানায়, তাই তো বেছে বেছে ওটাই কিনলাম।' বেশ গর্ব্বিত হয়ে কথাটা বল্লো কমলা।

'আরে নারায়ণদা তো তোকে সব কিছু পরলেই বলে ভালো দেখাচ্ছে, ওর কথা ছাড়।'

আজকাল আর ছেলেমেয়েদের মান্যমানতা বলে কিছু নেই, দিদির সঙ্গে ভারতী কেমন ভাবে কথা বলছে দ্যাখ! কিন্তু বিকিনি নামক বস্তুটা দেখে আমি তো অবাক! চুপ করে না থাকতে পেরে বলে উঠলাম, 'এসব তোরা পরবি নাকি?' আমার বলার ধরন দেখে দু'বোনে তো হেসেই অস্থির।

'তুমি যে কি বাবা, একদম কিচ্ছু জাননা। সাঁতার কাটতে গেলে বিদেশে এসব পরতেই হয়, তা না হ'লে জলে নামতেই দেবেনা।' আমি তো ভেবেই পাচ্ছিনা সাঁতার কাটতে গেলে ওসব ছাইভস্ম পরতে হবে কেন? আমাদের দেশের মেয়েরা কি আর শাড়ী পরে সাঁতার কাতে না? কিন্তু এদের এসব বোঝানো যাবে না, তাই চুপ করে গেলাম। ওরাও নিমেষে প্রসঙ্গ পাল্টে দিল।

'এই দিদি মনে আছে সেবার শিকাগোতে কি ঠান্ডা ছিল?'

'মনে আবার নেই, এবার ওদিকে বেশী ঠান্ডা না পড়লেই রক্ষা। গতবার আবহাওয়ার জন্যে ভাল করে বেড়ানোই হয়নি। এই ভারতী দেখি তোর জিনসের ফিটিংসটা কেমন?'

'ধুর আমার আর এখন ওসব পড়তে ভালো লাগছেনা। তা'ছাড়া এটাতো খুব সস্তায় কিনেছি, স্লেনে পড়বো বলে। আমেরিকায় গিয়ে গোটা কতক ডিসাইনার জিনস কিনতে হবে। আচ্ছা দিদি তুই কটা শাড়ী নিচ্ছিস রে?'

এরা কি জামাকাপড় ছাড়া আর কিছু জানেনা? ভারতীর প্রশ্নের জবাব শোনার আগেই দুই ভাই হৈ হৈ করতে করতে ঘরে ঢুকলো। কার্ত্তিকচন্দ্রের হাতে যথারীতি দোকানের প্যাকেট, কিন্তু গনশার কথা শুনে মনে হচ্ছে দু'জনের মধ্যে ঝগড়াটা বেশ জমেছে।

ওদের দেখে কমলা বলে উঠল, 'তোদের নিয়ে আর পারা গেল না, আবার ঝগড়া বাধিয়েছিস? দিনে দিনে তোদের বয়স বাড়ছে না কমছে?'

গনেশ বেশ রাগ দেখিয়ে বলে উঠলো, 'জানিস কেতোটা কি বলছে? আমেরিকায় নাকি আমার চেয়ে ওর পপুলারিটি বেশী। বাজে কথা বলার জায়গা পায়না।'

ভারতী বল্লে, 'তা হ'তেই পারে, তোরা কি পপুলারিটি কন্টেস্টে নেমেছিস নাকি?'

ফোঁস করে উঠে গনেশ বল্লে, - 'হ'তে পারে মানে? চোখ কান বন্ধ করে থাকিস নাকি? গত বারে দেখিস নি আমার কদর ওখানে? আমার ষ্ট্যাচু দিয়ে ঘর সাজাচ্ছে, আমার ছবি কাপড়ে ছাপচ্ছে, আর আমার বাহনটির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে কিনা বল।' এবার কমলা আর ভারতী দু'জনেই একসাথে বলে উঠলো, 'তোর চাইতে তোর বাহনের কদরই কিন্তু ওখানে বেশী। একটা ইঁদুরকে মিকি নাম দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত করে ফেলেছে আর এখন তো ঘরে ঘরে কমপিউটারের সাথে একটা করে যান্ত্রিক ইঁদুর আছে, ওটা ছাড়া তো কোন কাজি হয়না আজকাল।'

কার্ত্তিক দেখলো কথার মোড়টা গনেশের দিকে ঘুরে যাচ্ছে, তাই প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য বলে উঠলো, 'আমি ভাবছি এবার আমেরিকা থেকে একটা ব্ল্যাকবেরি নিয়ে আসবো। ওটা বেশ কাজের জিনিষ।'

এতক্ষন মহাদেব চুপ করে ওদের কথা শুনছিলেন, এবার নড়েচড়ে উঠে কার্ত্তিককে উদ্দেশ্য করে বল্লেন, 'আমেরিকা থেকে ফলটল আনতে যেওনা, একদম পচে যাবে। এখানে পথের ধারে অনেক বেরি পাওয়া যায়, ওগুলোই খাও। তোমাদের আজকাল এক ধারণা হয়েছে, বিদেশের সবকিছুই ভাল।'

বাবার কথা শুনে ভাই বোনেরা একসাথে হেসে উঠল, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলনা বাবা, কোথায় যে থাক, যুগের সাথে একটু সম্পর্ক রাখবে তো? ব্ল্যাকবেরি মোটেই ফল নয়, একটা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র, আজকাল খুব পপুলার।'

এইরে এবার পালাতে হবে। এতক্ষন তবু জামা কাপড় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, এখন এরা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে আলোচনা শুরু করলে কিছুই বুঝতে পারব না। তাছাড়া বেলাও প্রায় পরে এলো, এইবার একটু বেরোতে হবে, এই ভেবে মহাদেব দরজার দিকে এগোলেন। গেটের কাছে আসতেই পার্ব্বতীর সাথে দেখা, একগাদা জিনিসপত্র কিনেছে মনে হচ্ছে। কোনরকমে প্যাকেট গুলো সামলে নিয়ে জিগ্গেস করলো, 'কিগো বেরোচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, গাঁজাটা প্রায় শেষ হয়ে এল, যাই নিয়ে আসি গিয়ে, সন্ধে হওয়ার আগে।' এই বলে মহাদেব গাঁজা কেনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পরলেন।

From the desk of Cashier

Here is a statistics of the fund donated by the members

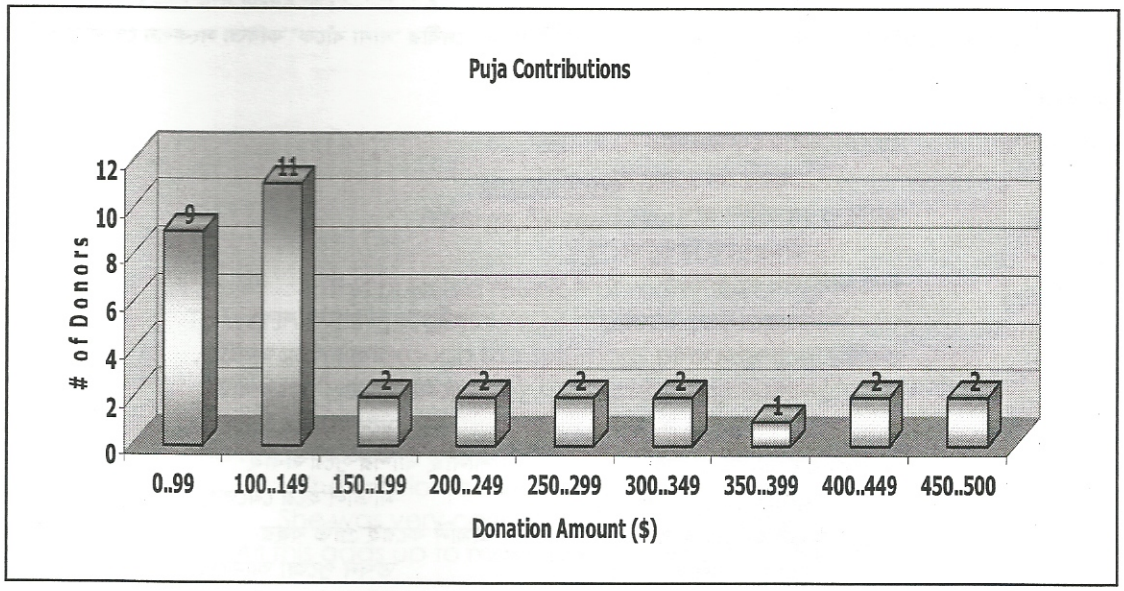

কবিতাগুচ্ছ

আগমণী

পারুল ব্যানার্জী

বাজা রে শঙ্খ বাজা!
আসিছেন মাতা তোদের দুয়ারে
ফুলে ফুলে গৃহ সাজা।
মঙ্গলঘট দে রে দোরে দোরে,
কদলীর গাছ দে রে তারি ধারে,
আল্পনা আঁকি দে রে মার তরে,
মা যে মোর দশভূজা।
শেফালী তার অঞ্জলী ভরি
দেয় মার রাঙ্গা চরণে,
কেতকী তাহার গন্ধে বার্তা
জানায় বিশ্বভুবনে।
স্থলের পদ্ম কার লাগি আজ ফুটিল?
আকাশের চাঁদ কার লাগি আজ উঠিল?
ধরনি পরেছে আজ নব সাজ
দুরে ফেলিয়া যত লোক লাজ
অপরাজিতার মুখে হাসি আর ধরে না।
চারিদিকে হেরি মঙ্গলময় করুণা।
যত গ্লানি ব্যথা ভুলে গেছে সারা বিশ্বে,
বিলাইছে প্রেম আপনারে করি নিঃশেষে।
রাজার দুলাল কাঙ্গালের ছেলে
এক সাথে সবে আসি মেলে,
চারিদিকে আজ আনন্দ ঢেউ নাচে রে,
একসাথে সব করে কোলাকুলি
কাহার করুণা যাচে রে।।

পুতুলের মা

পারুল ব্যানার্জী

সেদিন হঠাৎ দেখি খেলার মাঠে একি
একটি মেয়ে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
শুধাই তারে ডাকি কি নাম তোমার খুকি?
কয় সে মধুর স্বরে,
নামটি মায়ালতা মা কহেন মমতা
বাবা ডাকেন টুলু।
দিদি ডাকেন রুবি দাদা বলেন ছবি,
আদর করে ডাকেন কাকু বুলু।
নই আমি বুলবুল এইটুকু মোর চুল
নিত্য বাঁধি খোঁপা।
ছোট্ট ঘরে আমি করি না দুষ্টামি
তোমার মতই আমার আছে খোকা
তারেই আদর করি রাখি বুকে ধরি
দেখবে যদি আমার সাথে চল
গেলাম তাহার পিছু মুখটি করে নিচু
চক্ষু আমার করছে ছলোছলো।
ছোট্ট ঘরে গিয়ে দেখি অবাক হয়ে
মায়ার খোকন ঘুমায় বিছানাতে।
কাঠের হলেও সেটি আদরের নেই ত্রুটি
তুলে নিল কচি দুটি হাতে।
শুধায় মোরে হাসি নাম রেখেছি শশী
লোকে মন্দ বলে,
কি নাম তবে রাখি? সব নামই তো বাকি,
নাম না রেখে দিন কি যাবে চলে?
বলিনু তাই হেসে স্নেহ ভালোবেসে,
তোমার খোকন হব আমি মায়া,
এমনি করেই আদর দেবে এমনি ভাবেই বুকে নেবে,
পূর্ণ হবে নামটি রাখা মায়া।

[সদস্যা ভাস্বতী বিশ্বাসের দিদিমা, প্রয়াতা কবি শ্রীমতী পারুল দেবীর 'নানা বাঁকে' কবিতা সংকলন থেকে সংগৃহীত]

পুজো আসতো

দেবকুমার মুস্তাফি

ছোটোবেলায় বেলতলাতে
বোধন যখন বসতো,
মনটা তখন রঙ্গীন হয়ে
রামধনুতে মিশতো।
শিউলিফুলের গন্ধে যখন
বাতাস ভরে উঠতো,
নোটিস দিয়ে স্কুলে তখন
পুজোর ছুটি পড়তো।

মহালয়ার রাত-ভোরেতে
বাবাই ডেকে তুলতো,
'ওঠ-রে-ওঠ শুনতে হবে
আকাশবাণীর মন্ত্র '।
ঘুমের চোখে কানের ভিতর
কিছুই কি আর ঢুকতো,
ভোরের আলোয় শাঁখের বাজে
আসল ঘুমটা ভাঙ্গতো।

শারদীয়ার বইগুলো সব
পাহাড় হয়ে জমতো,
'' পুজো আসছে'' সে কথাটা
মনে করিয়ে দিতো।
শানাই বাঁশির সুরে সবাই
মাতাল হয়ে যেতো,
এমনি করেই প্রতি বছর
তখন পুজো আসতো।

কবিতাগুচ্ছ

মায়ের চিঠি
দোলা রায়

শরৎ এলো।
নিয়ে নতুন আলোর বাণী।।
সাদা মেঘের কানাকানি,
ভোরের শিশির, শিউলি ফুলের
গন্ধ নিয়ে এলো বয়ে ঘরে ফেরার আমন্ত্রণী।।

পুজো এলো।
ঢাকে কাঠি, প্রকৃতি আজ পরিপাটি।
নতুন কাপড়, নতুন খবর,
খুশির হাসি দীপ্ত মুখর,
দেখা-শোনা,যাওয়া- আসা,
প্রণাম- প্রীতি ভালোবাসা,
আলো ঝলোমলো।।

উমা গেল।
অন্ধকারে বাঁশের খাঁচা,
আবার লড়াই মরা বাঁচা।
মেনকা কয় চোখের জলে,
'আবার কবে আসবি কোলে?
বছরভরের প্রতিক্ষা
আর লাগে না ভালো'।।

এখনকারের উমারা আর
শিবঠাকুরের দেশের থেকে
নিয়ম করে ফেরে নাতো ঘরে।
জটিল জীবন কঠিন চলা
আর তো তাদের যায়না বলা
' বছর গেলেই আসিস আবার ফিরে' ।।

[কলকাতা নিবাসী লেখিকা দোলা রায়
সদস্যা দেবলীনা রায়ের মা]

খুঁজি তোমায়
বিপ্লব কুমার রায়

কখন ছিল সময় এমন,
ক্রোধ ছিল না ঋতায়নে?
কখন মানুষ ছিল ভাল,
পরিবর্ত্তনের বাতায়নে?
প্রদীপশিখা জ্বলার কালে,
লক্ষ বরুন বাঁধ সেধেছে,
শষ্য তবুও শিশির জোটায়
মহীরুহের আবাহনে।

আজতো সময়, সময় গড়ার,
পলাশ ফুলে আগুন রংয়ে,
তীব্র বুলেট, তীক্ষণ ঘৃণা,
তাকিয়ে আছে তোমার পানে.
সূর্য্য ভরে হাতের মুঠোয়,
আলোকায়নের সন্ধানে,
যশোদা-ধরার আশাবরী,
গাইতে হবে কলতানে।

সুলুক খোঁজার অবাক খেলা
নিস্বঃ হতাশ ধরিত্রীতে,
বলছে সবাই, কি লাভ পাবে
ণত্ববিধির বিপরীতে?
লাভক্ষতি নয় প্রাণের ব্যথা,
বুঝবে যদি সাধারনে,
সূর্য্য কেন তোমার মুঠোয়
আগুন কেন জ্বলে মনে?

ঠিকানা তোমার, এখনো খুঁজি
জঠর জালে, অন্তরালে,
স্নিগ্ধ কুসুম, হারায় আজো
শুকনো হাওয়ায়, ফুলের কালে।
তবুও আমি খুঁজবো তোমায়
ঋদ্ধতার স্বপ্নে মেতে,
বিশ্বাসে তুমি আসবে জেনে,
মাটির ঘ্রাণে মাতিয়ে দিতে।।

Durga Puja
Nisarga Nilotpal Paul

This puja is a reunion of many souls,
To worship Durga, goddess of motherhood and strength,
She gets us through the sufferings of our heavy tolls,
She made us all happy during our lifelong length.

The happiness she's brought, the despair she's banished,
The warrior she was make Ashur vanish,
She was very caring; she was very modest,
All this adds up to make her the bravest goddess.

Of the gods she was great, great scion.
She fought as bravely as her great steed lion.
To fight the evil she went a great, great length,
So we know her now as Durga, god of motherhood and strength.

বড়গল্প

শেষ চিঠি

দেবকুমার মুস্তাফি

প্রিয় শকুন্তলা,

গতকালই তোমার চিঠিটা পেলাম। চিঠিতে লিখেছো যে এবার তুমি শেষবারের মতো আমাকে মুক্তি দিতে চাও। আর কেউ না জানুক তুমিতো জানো, তোমাকে ভালবেসে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম। চিঠিতে আরো লিখেছো যে আমি যেন খুব বড় করে এক্ষুনি তোমার চিঠিটার উত্তর দিই। লিখতে বলেছো সমস্ত কথা যা তোমার আর আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত - একদম প্রথম থেকে শুরু করে এই চিঠিটার দাঁড়ি টানা অবধি। লিখেছো, যে কটা দিন এখানে থাকবো রোজ একবার করে তোমার চিঠিটা পড়বই - প্রেরণা পাবো বাঁচার। তোমার এক ধারণা আমি যেন বর্তমানের সিদ্ধিদাতা গণেশ - আমার মতো কেউ নাকি গুছিয়ে কথা বা গল্প, কিংবা চিঠি লিখতে পারে না। যখনই তোমার চিঠি পাই জানি একটা হোম-ওয়ার্ক তাতে থাকবেই। সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ ছেড়ে লেগে পড়ি তোমার এক এক অদ্ভুত আবদারের জোগান দিতে।

আবার আন্ডারলাইন করে দাও, কোনো অজুহাত তাতে চলবে না, বুঝলে। তবে তোমার কাছে এবার আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসলে কাল থেকে মনটা ভীষণ খারাপ, কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। আজ রবিবার, আমার হাতে লেখা এই চিঠিটা কালই তোমাকে স্পীড পোস্টে পাঠিয়ে দেবো।

তোমার কথামতো চিঠিটা শুরু করছি প্রথম থেকে। তুমি তো জানো যে স্কটিশ চার্চের সঙ্গে আমাদের প্রায় তিন পুরুষের সম্পর্ক, স্কুল পাশ করে ঐ কলেজেই ভর্তি হলাম। মানিকতলায় থাকতাম বলে পড়াশোনা করতে কখনও ট্রামে-বাসে চড়তে হয়নি। তুমি আহিরিটোলার মেয়ে, পড়তে হোলি চাইল্ড স্কুলে। স্কুল-জীবনে একই পথ দিয়ে আমাদের যাতায়াত ছিল, অথচ এখনো ভাবতে অবাক লাগে যে তোমাকে কোনদিন দেখিনি। পরে তুমি অবশ্য বলতে "নিশ্চয় দেখেছো, আমার তোমায় মনে আছে। ভালো ছেলের মতো একগাদা বই নিয়ে গুটি গুটি করে বিডন স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে যেতে।" তারপর কলেজ - তুমি ভর্তি হলে ইকনমিক্সে আর আমি নিলাম ইংলিশে অনার্স। লতায়-পাতায় একটা সম্পর্ক ছিল বলে, আমাদের এক আত্মীয় তোমার সঙ্গে আমাকে আলাপ করতে বলেছিল। তোমার বর্ণনা দিয়ে বলেছিল "দেখলেই চিনতে পারবি"। তার বর্ণনায় কোনো মিথ্যে ছিল না, কিন্তু পরিপূর্ণতার অভাব ছিল। অবশ্য দোষটা তার নয়, কারণ তোমার সৌন্দর্যের সঠিক বর্ণনা দেবার মত ভাষা তার মুখে ছিল না।

তোমাকে আবিষ্কার করেছিলাম কলেজ জীবনের প্রথম সপ্তাহেই। তোমাদের তরুণবাবু ফার্স্ট ইয়ার অনার্সের একটা ক্লাস নিচ্ছিলেন। তোমার নিশ্চয় মনে আছে অবোধের কথা - মানে ওর বাণী, আমরা বলতাম 'অবোধের বচন'। তোমার সঙ্গে যখন ওকে প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে "তোমার সাথে মিশবো কি করে, তাহলে তো ওই অবোধ শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে হবে।" কথাটা শুনে খুব হেসেছিলাম, কিন্তু অবোধকে কোনদিন বলিনি। অবোধের বুদ্ধিতেই ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তরুণবাবু বেরিয়ে যাবার বেশ কয়েক মিনিট পরে জনা দশেক বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে বেরোলে তুমি। মনে পড়ল সেই আত্মীয়র কথা। তোমাকে প্রথমবারের মতো শুধুই দেখলাম বললে ভুল হবে, দুচোখ ভরে উপলব্ধি করলাম তোমাকে। অবাক হয়ে, অপলক দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, জানিনা কতক্ষণ। জ্ঞান ফিরলো অবোধের ডাকে, "চলো চলো, কেয়াদির ক্লাস, দেরি হলে দিদি দেবে আচ্ছা করে।" যেতে যেতে অবোধ বলেছিল, "রাজকুমার, এই রাজকন্যা তোমার জন্যে নয়। আশা ছেড়ে দাও, নাহলে পরে কষ্ট পাবে।"

ফার্স্ট ইয়ারের মাঝামাঝি, ঢাকুরিয়ার আমাদের এক আত্মীয়র বিয়ে বাড়িতে আমার খুড়তুতো দাদা তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তখনই প্রথম জেনেছিলাম তুমি হচ্ছো আমার খুড়তুতো দাদার মাসতুতো দিদির ননদের মেয়ে - একটু কমপ্লিকেটেড। প্রচন্ড জড়তায় আমি বলেছিলাম, "কি আশ্চর্য্য, একই ইয়ারের, অথচ দেখা হয়নি।" সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাটা কাটা উত্তর, "তুমি নিশ্চয় খুব ভালো ছেলে তাই না, মেয়েদের সঙ্গে এখনও ভাববাচ্যে কথা বলো। কলেজে মেয়েদের দিকে তাকাও?" আমাকে অপ্রস্তুত হবার সময় না দিয়েই তুমি বলেছিলে, "তোমাকে আমি প্রায় রোজই দেখি। আচ্ছা, তুমি সব সময় আরো দুটো ছেলের সঙ্গে ঘোরো, তাই না? একজন ভীষণ লম্বা।" আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম। তুমি বলেছিলে, "চোখ দেখেছো আমাদের? আমরা তো ওই লম্বা ছেলেটাকে টনি বলে ডাকি, আর তোমাদের নাম দিয়েছি থ্রি মাস্কেটিয়ারস্।" তখন ইংল্যান্ডের ক্রিকেট টিম খেলতে এসেছিল, ওদের ক্যাপটেন ছিল টনি গ্রেগ - ভীষণ লম্বা। আমাদের অরিন্দমের হাইট ছ ফুট পাঁচ ইঞ্চি - কলকাতায় সচরাচর অত লম্বা ছেলে দেখা যায় না। তখন অরিন্দমকে অনেকেই টনি গ্রেগ বা টনি বলে ডাকতো। তবে অরিন্দমের দৌলতে আমাদের তখন অনেকেই চিনতো।

তারপরই শুরু হলো আমার এক নতুন জীবন। যদিও কোনদিন স্কুল-কলেজের ক্লাস কামাই করিনি, এই প্রথম উপলব্ধি করলাম কলেজের সময়ের আগে যাবার এবং পরে থাকার একটা নিবিড় আকর্ষণ। তুমি অবশ্য বলতে, "আমার সঙ্গে আলাপ হয়ে তোমার জ্বালা বেড়েছে, তাই না? বন্ধুদের সামনে আমার সাথে এখন কথা বলতে হয় - আওয়াজ থাও নিশ্চয়? রাজকুমার, এটা বিংশ শতাব্দী, একটু মেশো মেয়েদের সাথে। তা নাহলে রাজকুমারীর সন্ধান পাবে কি করে?" দূর থেকে আমায় দেখতে পেয়ে যখন আমার নাম ধরে ডাকতে, বন্ধুরা বলতো "তোর রাজকন্যা এসে গেছে, আমরা কাটছি।" বন্ধুরা আমার মনের কথা হয়ত আগেই বুঝে ফেলেছিল, তাই ওদের ঐ 'রাজকন্যা' সম্বোধনে আমি কোনদিন আপত্তি করি নি। পরে তুমি যখন জেনেছিলে তোমার মুখটা লাল হয়ে গেছিল, আরও সুন্দর লাগছিল তোমাকে। একটু রেগেই বলেছিলে "তোমার বন্ধুরা কেন আমায় ঐ নামে ডাকে, ওটা তো আমার নাম নয়।" একটু সাহস সঞ্চয় করে আমি একটা উত্তর খাড়া করেছিলাম, "তোমার নাম তো শকুন্তলা, সে তো রাজকন্যা - তাছাড়া আমাদের ভাগ্যে তো রাজকন্যা দেখার সুযোগ হবে না।" একটু ঠান্ডা হয়ে বলেছিলে, "তোমার সঙ্গে যুক্তিতে কেউ পারবে না। এত সুন্দর কথা বলো তুমি, তোমার সাথে কথা বলতে ভীষণ ভাল লাগে। আমি কিন্তু তোমার খুব বন্ধু হতে চাই - সুন্দর ফিলিংস্ থাকবে একজন আরেকজনের প্রতি।"

শুধুই ফিলিংস্ - কথাটা মনে ধরেনি, কিন্তু তখন আর কথা বাড়াইনি। ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষার রেজাল্ট পাবার পর মাকে গিয়ে প্রণাম করলাম। জল ভরা চোখে মা দৌড়ে গিয়ে জানিয়ে এল তার ছেলের সাফল্যের কথা সমস্ত ঠাকুর-দেবতাদের কাছে। মা তখন ভীষণ খুশী। সুযোগটা নিয়ে বলে ফেললাম তোমার কথা, "জানো মা, আমাদের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া নাকি আমাদের ইয়ারে পড়ে। অরিন্দম বলল ওরা নাকি আহিরিটোলায় থাকে, মেয়েটির নাম শকুন্তলা।" লজ্জায় কিনা জানিনা, মায়ের কাছে এমন একটা ভাব করেছিলাম যেন তোমার নামটা আগের দিনই জেনেছি। সঙ্গে সঙ্গে মা বলল, "ওতো শিবানীর মেয়ে, বেচারা। খুব ছোটবেলায় ও মাকে হারিয়েছে।" মায়ের দুচোখ জলে ভরে উঠলো। নিজেকে একটু সংবরণ করে মা বললো, "মেয়েটিকে খুব সুন্দর দেখতে নারে? খুব ছোটবেলায় একবার দেখেছিলাম শিবানীর সাথে। ঠিক যেন ছোটবেলার শিবানী, একদম ডল-পুতুলের মতো দেখতে ছিল। একদিন নিয়ে আসিস না আমাদের বাড়িতে।"

সেই দিনই মায়ের মুখে জেনেছিলাম তোমাদের ফ্যামিলির কথা। বলতে পারো সমস্ত কথা - যার পাঁচ শতাংশও তুমি কোনদিন মুখ ফুটে বলনি। তোমার বাবা ছিলেন বিরাট বড় আই পি এস্ অফিসার। বিশাল বড় কোয়ার্টার এসপ্ল্যানেডে। তোমার মায়ের নাকি ব্রেস্ট ক্যানসার হয়েছিল। ডাক্তারদের ধরার আগেই রোগটা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল। তোমার বাবার প্রচন্ড চেষ্টা সত্তেও কিছু করা সম্ভব হয়নি। তোমার মায়ের শ্রাদ্ধের দিনে যেখানে তোমার মায়ের কাজ হচ্ছিল, সেখানে তুমি একটা ডল-পুতুলকে কোলে নিয়ে আপনমনে খেলছিলে। মা বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদছিল, সেদিন নাকি সবাই খুব কেঁদেছিল তোমায় দেখে। তোমার মা মারা যাবার পর তুমি বেশির ভাগ সময়ই থাকতে

তোমার দিদার বাড়িতে আহিরিটোলায়। ছুটি হলেই তোমার বাবা নিয়ে যেতেন ওনার কাছে, পারলে সবটুকু সময়টায় কাটাতেন তোমার সঙ্গে। তোমার আত্মীয়-স্বজনরা নাকি কোনদিন বুঝতে দেয়নি তোমায় মায়ের অভাব। সেদিন রাতে এসব কথা শুনে কিছুতেই ঘুমতে পারিনি, ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তোমার কথা ভেবে। মনে হচ্ছিল ওই মাঝরাতেই একদৌড়ে চলে যাই তোমার কাছে। পরের দিন সকালে আগে গিয়ে কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম তোমার জন্যে, তোমাকে দেখেই বলেছিলাম, "শকুন্তলা, দেরি করলে যে, কেমন আছো?" আমার কথা শেষ হবার আগেই তুমি বলেছিলে, "তুমি কি এই কথাটা বলার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলে? ফার্স্ট হয়ে তোমার সাহস তো খুব বেড়ে গেছে দেখছি।"

জানো শকুন্তলা, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার একটা ভীষণ মিল আছে। আমার যখন সাত বছর বয়স তখন আমার বাবা মারা যান। তাই অতটা ভেঙে পড়েছিলাম সেদিন। মায়ের অনুমতি পাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমাকে নিয়ে এলাম আমাদের বাড়িতে। মা তো রেগে আগুন, কেন আমি আগে থেকে জানাইনি যে তোমাকে নিয়ে যাবো। রাজকন্যাকে যে মা কিভাবে আপ্যায়ন করবে, তার যোগান দিতে হোলো আমাকে। মা তোমায় বলেছিল, "আমি তোমার সম্পর্কে দিদা হই।" তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলল, "না, তা হবে না। আপনি রাজকুমারের মা, আমার মায়ের সমান। আপনাকে আমি মাসিমা বলে ডাকবো।" রাজকন্যার আবদার, খন্ডাবে কার সাধ্যি। তোমাদের দুজনের গল্প করা দেখে মনে হচ্ছিল তোমরা যেন একে অপরকে চেনো আগের জন্ম থেকে। মা যখন রান্নাঘরে যাচ্ছিল তুমি মাকে সঙ্গ দিচ্ছিলে পাশাপাশি পিঁড়িতে বসে। তারপর যাবার পালা, রাতে না খাইয়েই তোমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল মা। ঐদিন তোমার বাবা আসবেন আহিরিটোলায় তোমাকে দেখতে। তোমার বাবার পাঠানো গাড়িতে যখন আমরা তোমায় তুলে দিলাম, তুমি মাকে প্রণাম করলে। মা তোমায় জড়িয়ে ধরে আশীবাদ করে বলেছিল, "প্রথম আলাপেই তোমার উপর মায়া পড়ে গেলো মা। এবার থেকে তোমাকে কিন্তু মাঝে মাঝে আসতে হবে আমার সঙ্গে গল্প করতে।" যা ভেবেছিলাম তাই - মায়ের পোষ্য সন্তানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো তিনটিতে, অরিন্দম, অবোধ এবং তুমি।

কলেজ জীবন - যার মধ্যমণি ছিলে নিঃসন্দেহে তুমি। এছাড়া ছিল আর একটি নেশা, তিন বন্ধু মিলে ভাল থিয়েটার দেখার। হঠাৎ শম্ভু মিত্র তখন ঘোষণা করলেন আর উনি নাটক করবেন না। যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। তখনও 'ওডিপাস্' দেখা হয়নি, আর মাত্র দুটো শো বাকি। রবিবার ভোরবেলায় ছুটলাম তিনজনে একাডেমি অব ফাইন আর্টসে, ফিরলাম বিষণ্ণ হয়ে। পরের দিন অরিন্দমের মারফত সেই বার্তাও তোমার কানে পৌছল। আসল ঘটনা ঘটলো তার পরের দিন। আমরা তিন বন্ধু ক্যান্টিনে বসে আছি, হঠাৎ তোমার ডাক কানে এল, "রাজকুমার, তোমাদের জন্যে একটা গুড আর একটা নট-সো-গুড নিউজ আছে। কাল তোমাদের ঐ করুণ অবস্থা দেখে বাবাকে বলেছিলাম। বাবা জোগাড় করে দিয়েছে একদম ফ্রন্ট রোয়ের টিকিট। শুনলাম টিকিটের নাকি ভীষণ ডিম্যান্ড। সরি, দুটো টিকিট পাওয়া গেছে, এবার তোমরা ঠিক করো কোন দুজন যাবে।" আমাদের মধ্যে অবোধই ছিল একটু অকালপক্ক। বললে, "শকুন্তলার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে রাজকুমার, তুমি আর শকুন্তলা যাও।" মোস্ট ডিফিক্যাল্ট সিচুয়েশানে বলটা আমার দিকে ঠেলে দিল। গোলটা করতে না পারলে আমার দোষ, আর পারলে কৃতিত্বটা হবে ওর। আমার করুণ মুখটা দেখে তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলে, "দেখো, তোমাদের মতো অত থিয়েটার আমি দেখি না, তবে যেতে আমার আপত্তি নেই। কি রাজকুমার, ভাবছো তোমার রাজকুমারীকে কি জবাবদিহি দেবে ভবিষ্যতে?"

ওইদিন গাড়ি করে এসে আমায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়েছিলে তুমি। সামনে ধবধবে সাদা পোষাকের ড্রাইভার আর পেছনের সিটে তুমি আর আমি। শকুন্তলা, সেদিনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের ঘটনা আমি স্তরে স্তরে অতি যত্ন করে মনের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছি। মাত্র উনিশ বছর বয়স তখন আমাদের। প্রথম একা পেয়েছিলাম তোমাকে। গাড়িতে ঢুকে অবাক হয়ে দেখেছিলাম তোমার রুপ। ভীষণ সুন্দর করে সেজেছিলে তুমি, চওড়া পাড়ের শাড়ি সঙ্গে বড় একটা লাল টিপ, মনে হচ্ছিল তুমি সত্যিই এক রাজকন্যা। সেদিনই প্রথম আমার নামকরনের হেতুটা উপলব্ধি করেছিলাম। মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছিল, ভাবছিলাম কোন জগতে আছি - একি স্বপ্ন না বাস্তব। অনেক বড় বড় লোকেরাও এসেছিল নাটক দেখতে। ওইদিনের প্রতিটি সেকেন্ড, সমস্ত কিছু আমার মনে আছে - একাডেমি অব ফাইন আর্টস্, ফ্রন্ট রোয়ের টিকিট আর তোমার সুগন্ধি গা স্পর্শ করে বসে শম্ভু মিত্রের শেষ নাটক দেখা। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলাম, হোয়াট এলস্ ক্যান ইউ এক্সপেক্ট রাজকুমার?

ফাইনাল ইয়ারের মাঝামাঝি হঠাৎ তোমার জেদ চাপলো আরো পড়াশুনা করতে হবে। একদিন এসে আমাকে বললে, "দেখো রাজকুমার, আমি খুব ভাল করেই জানি যে তোমার মতো ভাল রেজাল্ট কোনদিন করতে পারবো না। বাট্, আই সুড ট্রাই মাই বেস্ট।" তারপরই একগাল হেসে আরও বললে, "একবার চেষ্টা করে দেখি তোমার গন্ডীতে ঢোকা যায় কি না।" বেশির ভাগ সময়টায় থাকলে পড়াশুনায় ডুবে। পার্ট টু পরীক্ষার পর তিনটে মাস খুব আনন্দে কেটেছিল, তাই না? তারপর সেই দিনটা - কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে বুলেটিনে আমার রোল নাম্বারের পাশে দেখলাম রোমান লেটারে ওয়ান লেখা। এক দৌড়ে পৌছলাম কলেজে তোমার খবরটা জানতে। গেটের মুখে মনে হয় যেন শুনলাম যে এবার আর্টসে দুটো ফার্স্ট ক্লাস। ভেতরে ঢুকতেই, এসেম্বলী হলে প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে মনে হলো এক জটলা। সামনে যেতেই দেখলাম তোমাকে, দুচোখ ভরা জল, কাকে যেন খুঁজছো তুমি আর তোমাদের চন্দ্রকান্তবাবু তোমার গায়ে হাত রেখে কিছু একটা বলছেন। ব্যাপারটা বোঝার আগেই উনি এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, "কনগ্রেচুলেশান্ রাজকুমার। আমরা সবাই ভীষণ খুশি হয়েছি তোমার এবং শকুন্তলার সাফল্যে। উইশ্ ইউ দি বেস্ট ফর ইয়োর ফিউচার।"

মনে পড়ল মায়ের কথা, মা নিশ্চয় দাঁড়িয়ে থাকবে খবরটার জন্যে। আমরা চারজন এক সাথেই বেরোলাম কলেজ থেকে। অরিন্দম ও অবোধ চলে যাবার পর, হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তুমি বললে, "তোমার সঙ্গে কি আমি আসতে পারি? আজ বাবার একটা খুব জরুরী মিটিং আছে। এখনও ঘন্টা দেড়েক লাগবে বাবার মিটিং শেষ হতে। চল এই ফাঁকে মাসিমাকে একটা প্রণাম করে খবরটা দিয়ে আসি।" দুজনে মিলে হাঁটা লাগালাম বাড়ির দিকে। যেতে যেতে বললাম, "সত্যি কথা বলতে কি জানো শকুন্তলা, আজকের এই দিনটা তোমার। সবাই বেশি খুশি হয়েছে তোমার খবরটায়, আমিও তাদের একজন। কেন জানো? আজ তুমি আবার প্রমাণ করলে - ইফ্ ওয়ান রিয়েলি ওয়ান্টস্ সামথিঙ্, ওয়ান ক্যান হ্যাভ্ ইট। কিন্তু তোমার মত তপস্যাও করতে হবে তাকে।" তুমি আমার কথাটায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে বললে, "প্লীজ্ রাজকুমার, তোমার জ্ঞান দেয়া স্বভাবটা আজকে একটু থামাবে?" তারপর একটু থেমে বলেছিলে, "দেখো রাজকুমার, সবাই আমার এই সাফল্যের কথাটা হয়ত বা কিছুদিন মনে রাখবে, কিন্তু কেউ কোনদিন জানবে না এর পিছনে কার প্রেরণা ছিল।"

পাড়ার মোড়ে পৌছতেই বুঝতে পারলাম মাকে আর খবরটা দেবার কিছু নেই। বাড়ি ঢুকে দেখি ঘরভর্তি লোক। জানো শকুন্তলা, মা সেদিন সত্যিই অবাক হয়েছিল তোমাকে দেখে। তোমার প্রণাম করার আগেই মা তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। এই প্রথম তোমায় দেখেছিলাম কান্নায় ভেঙে পড়তে - হয়ত নিজের মায়ের কথা ভেবে। তোমার তাড়া ছিল বাড়ি ফিরতে হবে, নিজের মুখে খবরটা দিতে হবে তোমার বাবাকে। মা বলল, "তুই ওর সঙ্গে যা। ও যেমন এসেছে, তুইও তেমনি ওর বাবা আর দিদাকে প্রণাম করে নিজের মুখে খবরটা দিয়ে আয়।" এই প্রথম তোমাদের আহিরিটোলার বাড়িতে গেলাম, বাড়িতে তখন তোমার দিদা একা। ওনার তখন প্রায় ষাট বছর বয়স, কিন্তু তখনো কি রূপ। অতো ভাল খবর শুনে উনি যে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এমন করে গলাটা ওনার জড়িয়ে ধরেছিলে তুমি, দিদা কোনো কথাই বলতে পারছিলেন না। কষ্ট করে তোমাকে ছাড়িয়ে বললেন, "ছাড় ছাড়, এক্ষুনি তোর বাবা এসে পড়বে।" আমি পরিচয় দিয়ে প্রণাম করলাম দিদাকে, আমার খবরটাও দিলাম সেইসঙ্গে। আমাকে আশীবাদ করে উনি বললেন, "তুমিই আমাদের চুমকির রাজকুমার!" সঙ্গে সঙ্গে দিদার গালটা টিপে বলেছিলে, "ও চুমকির বন্ধু, ওর নাম রাজকুমার।" তারপর দিদার কানে কি সব বললে, মনে হয়েছিল যে দিদা তাতে রাজি হচ্ছিলেন না, কিন্তু শেষে মেনে নিলেন তোমার আবদার। তারপর আমাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটু পরেই তোমার বাবা এলেন। তুমি পাশের ঘরে গিয়ে পর্দার আড়ালে লুকোলে। বাইরের কথা শুনে মনে হলো যে তোমার বাবা একটু অবাক হয়েছেন তুমি তখনো ফেরনি বলে। তখনি বুঝলাম একটু আগে দিদার কানে কি ফুস্-মন্তর দিয়েছিলে। ঘরে ঢুকতেই তোমার বাবাও সেটা বুঝলেন, দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলেছিলে, "কি বাবা, মনে আছে, সব সময় বলতে - চুমকি, তোকে নিয়েই আমার চিন্তা, একদম পড়াশোনা করিস না। ফার্স্ট ক্লাস বাবা, তোমার অর্থনীতিতে একদম ফার্স্ট ক্লাস।" তোমার বাবা বললেন, "দাঁড়া, এটাচিটা নামাতে দে। হ্যাঁরে, তোর কলেজের বন্ধুরা সব পাশ করেছে? ইউনিভার্সিটির যা অবস্থা এখন।" আমি তখন পাশের ঘর থেকে এসে পরিচয় দিয়ে প্রণাম করলাম তোমার বাবাকে। তুমি বললে, "রাজকুমারও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, তবে ওটাতে কেউ অবাক হয়নি, ও ফার্স্ট ক্লাস না পেলে সেটাই হতো হেডলাইন নিউজ। আজ কলেজে তোমার চুমকি মেড দা হেডলাইন।" তোমার বাবা সঙ্গে সঙ্গে তোমারই মনের প্রশ্নটা তুলেছিলেন, "চুমকি, ডিড ইউ থ্যাঙ্ক্ দোজ্ হু ইনসপাইয়ার্ড ইউ?"

খেতে খেতে জমিয়ে গল্প হোলো অনেকক্ষন, দিদাও কাজের মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিলেন আমাদের সঙ্গে। একে একে এলেন তোমার দুই মাসি, মামা আরও কিছু আত্মীয়-স্বজন। জানলাম আমার পরিচয় অল্পবিস্তর সবাই জানে। মনে হয়েছিল প্রথম আলাপেই তোমার দিদা আর বাবা আমাকে খুব পছন্দ করেছিলেন, যদিও ধরেই নিয়েছিলাম তার পেছনে তোমার নিশ্চয় কারসাজি ছিল। তোমার বাবাতো বলেই ফেললেন, "দেখো, চুমকি কলেজে কি করতো তার খবর ওর মুখ থেকেই আমাদের শুনতে হতো। চুমকি আমাদের সবার কাছে তোমার অনেক গুণগান করেছে। জিজ্ঞাসা করে দেখো ওর দিদাকে। শুনেছি তুমি যখন কলেজে ইংরাজি বা বাংলায় কবিতা বলো, সবাই নাকি অবাক হয়ে শোনে। তাহলে আমাদের একটা ছোট কবিতা শোনাও।" একটু কিন্তু কিন্তু করেছিলাম প্রথমে তারপর শোনালাম রবি ঠাকুরের একটা ছোট্ট কবিতা 'রূপ-নারানের কুলে'। তোমার বাবা খুব প্রশংসা করেছিলেন। এবার ওঠার পালা। তোমার বাবা বললেন, "তোমাকে আর চুমকিকে আমি ডিনারে নিয়ে যাবো, টু সেলিব্রেট। কাল হবে না, তাছাড়া তোমারও কাজ থাকতে পারে। যদি অসুবিধে না হয়, পরশুদিন ড্রাইভারকে আমি বলে দেবো তোমাদের নিয়ে আমার ওখানে চলে আসতে।"

ডিনারে যাবার দিন, গাড়িতে উঠেই দেখলাম তোমার মুখটা বেশ গম্ভীর। একটা দুটো হ্যাঁ-বা-না উত্তর দেয়া ছাড়া বেশির ভাগ সময়টা বাইরের দিকেই তাকিয়ে ছিলে। সোজা গেলাম বেঙ্গল ক্লাবে, তখন তোমার বাবাও এসে পৌছে গেছেন। ভেতরের একটা টেবিলে বসলাম তিনজনে। তোমার বাবাই কথাটা পাড়লেন, তখনি বুঝলাম তোমার গম্ভীরতার কারণটা। রেজাল্ট বেরনোর দিন তোমার বাবার জরুরী মিটিংটার বিষয়। প্রধান মন্ত্রীর এক বিশেষ দপ্তরে তোমার বাবাকে একটা বড় প্রমোশান দিয়ে সেন্ট্রাল গভর্মেন্ট ওনাকে দুবছরের জন্যে দিল্লি পাঠাতে চান। তোমার বাবার খুব নাম, তাছাড়া সবাই তোমার মায়ের কথাটাও জানতেন। তুমিও কলেজ পাশ করে গেলে, সব কিছু ভেবে তোমার বাবাও না করতে পারেন নি। উনি তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যদি তুমি দিল্লিতে এম এ টা পড়। তোমার বাবা বললেন, "কাল সন্ধ্যে বেলায় এটা জানার পর থেকে তার আর কোন কথা নেই আমার সঙ্গে, শুধু বলেছিল দিদাদের জিজ্ঞেস করে ঠিক করবে। কাল রাতে দিদাকে সঙ্গে নিয়ে, কান্নাকাটি করে আমার কাছে কথা আদায় করে নিয়েছে যদিও আমরা যাই, ঠিক দুটো বছর, একটা দিনও বেশি না। আজ রাতে মেয়ে আমায় সঠিক জানাবে বলেছে। পরের দুটো বছরতো তোমাদের ঝড়ের মতো কেটে যাবে, তাই না?" আমি চুপ করে সব শুনছিলাম। তুমিতো আমায় দেখেছো প্রায় তিনটে বছর। যে বিষয় আমার আয়ত্তের বাইরে, সে বিষয়ে আমি কোন মন্তব্য করি না। ভাবছিলাম পুরো ঘটনাটার কথা, একটু জটিল, কিন্তু তোমার বাবারও কোন দোষ ছিল না তাতে। হঠাৎ উনি ভীষণ কঠিন একটা প্রশ্ন করলেন আমায়, "জানো, ছোটবেলা থেকেই চুমকির বন্ধুদের প্রতি খুব বিশ্বাস। আচ্ছা তোমার কি মনে হয়? শকুন্তলার মত তোমার সিচুয়েশান্ হলে, তুমি কি করতে?"

প্রশ্নটা শুনে, বিশেষ করে তখনি তার উত্তর দিতে হবে জেনে, সত্যি একটু নার্ভাস্ হয়ে গেছিলাম। একটু ভেবে যখন মুখটা তুলে তোমার দিকে তাকালাম, দেখলাম তুমি জ্বল জ্বল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ। মনে হচ্ছিল যেন আমার উত্তরের জন্যে তুমি অপেক্ষা করছিলে। হঠাৎ মনে পড়ল আমার মায়ের কথা, আমাকে ছেড়ে মা দুটো দিনও কোথাও গিয়ে থাকতে পারতো না। তাই সেদিন যে কথাটা প্রথমে বলেছিলাম সেটা আমার মনের কথা, তোমাকে একা পেলে হয়ত আরো ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম। বলেছিলাম, "মাত্র তো দুটো বছর, দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তাছাড়া প্রচন্ড ব্যস্ত থাকবেন আপনারা দুজনেই।" সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাবা বললেন, "থ্যাঙ্ক্ ইউ রাজকুমার। দেখলি চুমকি, কাল রাতে এই কথাটাই তোদের আমি বলেছিলাম।" সেদিন ঐ প্রথম তোমার একটু হাসি মুখ দেখলাম। ওইখানেই যদি থেমে যেতাম তাহলে হয়ত আজকের জীবনটা অন্য রকম হতো। ব্যাপারটাকে একটু হালকা করার জন্যে বলেছিলাম, "শকুন্তলা, তুমি জে এন ইউএ পড়বে, নতুন জায়গা, নতুন বন্ধু হবে। দেখো, তোমার খুব ভাল লাগবে। হয়ত আমাদের ভুলেই যাবে তখন।" তখন আমাদের ডিনার প্রায় শেষ। আমার দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েই, চোখটা ঘুরিয়ে নিলে তোমার বাবার দিকে। বাবাকে জানালে এক্ষুণি তুমি বাড়ি যেতে চাও। মনে হলো তোমার শরীরটা হয়ত খারাপ। তোমাদের সঙ্গে ডিনারে যাবো বলে সকাল থেকে উদগ্রীব হয়ে বসে ছিলাম, কিরকম যেন হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেলো দিনটা।

তারপর বাড়ি ফিরে মাকে শুধু বলেছিলাম তোমরা দুবছরের জন্যে দিল্লি যাবে। ছোটবেলা থেকে মায়ের কাছে শিখেছিলাম কাউকে মনে আঘাত না দিতে। ঐ কথাগুলো যে কিভাবে ফেরত নেবো তাই ভেবে একটা সপ্তাহ পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালাম। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে তোমাদের বাড়ি গেলাম খবরটা দেবার অজুহাতে। তোমার দিদা জানালেন তোমরা তিন দিন আগে দিল্লি চলে গেছো। তারপর অবোধ গেলো এম বি এ পড়তে, অরিন্দম ঢুকলো সায়েন্স্ কলেজে পিওর কেমিস্ট্রিতে আর আমি শুরু করলাম ইংলিশে এম এ। শুরু হলো আর এক জীবন, ভীষণ একা হয়ে পড়লাম। দিল্লি থেকে একবছর পরে পূজোর ছুটিতে যখন ফিরেছিলে কলকাতায়, আমাদের বাড়িতেও এসেছিলে তোমার বাবার সঙ্গে, মাকে বিজয়ার প্রণাম করতে। সেদিনের বেশির ভাগ সময়টা তুমি ছিলে মায়ের সাথে, আমি দোতলায় তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলছিলাম। তোমার বাবা তোমাকে আরো একটু থাকতে বলেছিলেন, উনি যাবার পথে তোমায় তুলে নিতেন। আমার মাও সেটা চেয়েছিল, কিন্তু তুমি মাকে প্রণাম করে ওনার সাথে চলে গেলে। যাবার সময় আমার দিকে একবার তাকিয়ে শুধু বলেছিলে, "আসছি।" তোমরা যাবার পরেই মা একটু বকুনির মতোই বলেছিল, "তুই কি রে? এতদিন পরে মেয়েটা এল আমাদের বাড়ি আর তুই একটু থাকতে বলতে পারলি না।"

পরের বছরটা পড়াশুনো করেই কেটে গেলো। এম এ পাশ করে একটা ফেলোশিপ্ পেলাম ডক্টরেট্ করার জন্যে আর তোমাদের ফেরার পথ চেয়ে দিন গুনতে লাগলাম। একদিন আর থাকতে না পেরে গেলাম তোমাদের আহিরিটোলার বাড়িতে, দিদার সঙ্গে দেখা করতে। দরজার সামনে দেখলাম তোমার বাবার গাড়িটা। তোমার দিদা আর বাবাকে প্রণাম করে দিলাম আমার ভাল খবরগুলো। তারপরই পেলাম তোমার খবর। এম এ তে খুব ভাল রেজাল্ট করে একটা ফেলোশিপ্ পেয়ে তুমি গেছো লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে পি এচ্ ডি করতে। দারুণ খবর, ভীষণ আনন্দ হয়েছিল সেটা জেনে। তোমার বাবার হাত দিয়ে পাঠানো ছোট্ট একটা চিঠিও পেলাম সেইসঙ্গে। লিখেছিলে, "প্রিয় রাজকুমার, আরো দূরে চললাম, বলতে পারো একটু জেদে। কলকাতার একটা সাধারণ মেয়ের দৌড় যে কতদূর হতে পারে সেটা নিজের চোখেই দেখতে চাই। তোমার নতুন বন্ধুবান্ধবদের সব খবর কি? মাসিমাকে ভীষণ মনে পড়ে। মাসিমাকে বোলো যে প্রণাম করে, নিজের মুখে খবরটা দিতে না পারাতে আমি খুবই দুঃখিত। মাসিমাকে আমার প্রণাম দিও আর তোমার নতুন জীবনের জন্যে শুভেচ্ছা রইল, ইতি - শকুন্তলা।"

প্রায় তিন বছর পরে, এক মাসের ছুটি নিয়ে তুমি প্রথম ফিরেছিলে লন্ডন থেকে কলকাতায়। তোমার বাবা আমাকে তার পরের দিনই আহিরিটোলার বাড়িতে আসার নেমন্তন্ন করলেন। জানো শকুন্তলা, একটু সংকোচ যদিও ছিল, কিন্তু ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল তোমাকে দেখতে। বাড়িতে ঢুকেই সেই ভয় বা সংকোচ বোধটা কেটে গেছিল তোমার

বাবার আর দিদার আপ্যায়নে। তুমি তখন চানে ছিলে, আমরা চা খেতে খেতে গল্প করছিলাম। একটু পরে পর্দা সরিয়ে তুমি ঢুকলে ঘরে। অবাক হয়ে দেখছিলাম তোমায়, ভুলেই গেছিলাম ঘরের অন্য গুরুজনদের কথা। মাত্র কয়েক বছরে তোমার সৌন্দর্য্যের মাত্রা আরো দশগুণ বেড়েছে কমপক্ষে। তুমি বলেছিলে, "কেমন আছ রাজকুমার, মাসিমা ভাল আছেন? এসে থেকে বাবা আর দিদা তোমার যা প্রশংসা শুরু করেছে, তোমার পায়ের ধুলো নিতে হবে দেখছি।" সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাবা বললেন, "তুইতো আর এখানে থাকিস না, ওর স্টেটসম্যানে লেখা পড়ার জন্যে লোকে বসে থাকে। ওর পায়ের ধুলোয় তোর নেয়া উচিত।" তারপরই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজ খুব আনন্দের দিন, দিদাকে দেখে বুঝতে পারছো? আজ কিন্তু তোমায় দুটো কবিতা শোনাতে হবে। একটা আমার পছন্দ - 'রূপ-নারানের কূলে', আর একটা তোমার পছন্দ মত।" সুযোগটা পেয়ে ভাবলাম দেখি শেষ চেষ্টা করে যদি ফিরিয়ে আনতে পারি রাজকন্যাকে তার পুরোনো রাজকুমারের দেশে। পরের কবিতাটা ছিল তোমার সবচেয়ে প্রিয়, রবি ঠাকুরের 'দায়মোচন' - বিশেষ করে ঐ লাইনটা 'তবু ভালোবাস, যদি বেসো'। অবাক হয়ে শুনলে তুমি, ঠিক যেমনটি করে শুনতে আমাদের কলেজ জীবনে।

প্রায় পাঁচ বছর পর মনে হ'ল হয়ত বা ফিরে পেলাম জীবনটা আগের মতো করে। যদিও সেই রাতে বাড়ি ফিরে মাকে বিশেষ কিছু বলিনি পাছে মা আবার আর এক আশার ঘর বানাতে শুরু করে। পরের দিনই মনটাকে শক্ত করে আবার গেলাম তোমাদের বাড়ি, তোমাকে সঙ্গে করে নিয়েও এলাম আমাদের বাড়িতে। মিষ্টি আনতে গিয়ে খবর পাঠালাম অরিন্দমকে, একটু পরেই অবোধ ও অরিন্দম এলো। আসলে এই কটা বছর ওরা দুজনে আমাকে ভীষণ সঙ্গ দিত, চেষ্টা করতো যতটা সম্ভব এই ব্যাপারটা থেকে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে। মায়ের ভীষণ আনন্দ হয়েছিল সেদিন আমাদের চার জনকে পেয়ে। ফিফটি নাইন সিমলা রোডে সেই পুরনো দিনের মত জমিয়ে আড্ডা। তোমরা চলে যাবার পর এই প্রথম মা জানতে চেয়েছিল সেই বেঙ্গল ক্লাবের ডিনারের কথা। মাকে বলেছিলাম সেদিনের সব কথাই। স্বাভাবিক কারণেই মা বলেছিল, "ওর ভালবাসাকে তুই এরকম ভাবে আঘাত দিয়ে ছিলিস? এতদিন মিশেও তুই মেয়েটার মনের কথা বুঝিস নি।" যেহেতু বহুবার শুনেছি আমার দুই বন্ধুর মন্তব্য আর সমালোচনা এ ব্যাপারে, তাই সেদিন মায়ের বকুনিটা চুপ করে হজম করতে সময় লাগেনি।

তারপর তোমার দেশে থাকার বাকি আটাশটা দিন খুব আনন্দে কেটেছিল, তাই না? তার মধ্যে পঁচিশটা দিনই তোমার সঙ্গে কোন না কোন অজুহাতে দেখা করেছিলাম, মনে পড়ে? তিন বছরের ফেলোশিপ্ টা শেষ হবে জেনেই কলেজ সার্ভিস্ কমিশনে এবং আরও বেশ কয়েক জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়ে রেখে ছিলাম। তুমি থাককালীনই তিনটে চাকরি প্রায় একসঙ্গে পেলাম, তার মধ্যে একটা ছিল বর্দ্ধমান ইউনিভার্সিটি আর একটা আমাদের স্কটিশ চার্চ কলেজ। খবরগুলো শুনে মা আর তোমরা তিন বন্ধু ভীষণ খুশি হয়েছিলে, আমি যদিও একটু দোটানায় ছিলাম। একদিন আমাদের বাড়িতে জমিয়ে আড্ডা হচ্ছিল, হঠাৎ তুমি মাকে বললে, "মাসিমা, ঠিক করলেন ছেলে কোন চাকরিটা নেবে?" মা বললো, "আমি একা কেন মা, তোমরা তো সবাই আমার নিজের সন্তানের মতো, তোমরা সবাই মিলে ভেবে ওকে বলো।" আমার বেচারা মায়ের ঐ ফুলটস্ বলটা পেয়েই একটুও সময় নিলে না ওভার বাউন্ডারি করতে, বললে, "ও যদি পড়ানোর চাকরিই করে, তাহলে আমরা চাই ও স্কটিশ কলেজেই আবার ফিরে আসুক।" কথাটা যদিও তুমিই বলেছিলে, আমি জানতাম তোমরা তিন বন্ধু মিলে আগেই আলোচনা করে রেখেছিলে। কাজেই আমার চাকরি-সন্ধানের পালায় ঐখানেই ইতি টানতে হলো।

তখন তোমারও পি এচ্ ডির কাজ প্রায় শেষ। অর্থনীতির ব্যাপারে আমি ছিলাম অরিন্দমের সঙ্গে একমত - নীতি তার একটাই, অর্থ পেলেই খরচ করো। এই ব্যাপারটায় অবোধের সঙ্গেই তোমার মিলতো ভাল। একটা মাস কি রকম ঝড়ের মত কেটে গেলো, তাই না? তোমার যাবার সময় হলো, এই প্রথম এয়ারপোর্টে গিয়ে প্রথম একজনকে বিদায় জানালাম। ভীষণ খারাপ লেগেছিল, তখনই মনে মনে ঠিক করেছিলাম কাউকে ছেড়ে দিতে আর কোনদিন এয়ারপোর্টে যাবো না। তুমি যাবার পর ভীষণ খারাপ লাগছিল, কিন্তু তোমার প্রথম বারের দিল্লি চলে যাবার মতো অত কষ্ট পাইনি মনে। মাস কয়েক পরে পি এচ্ ডির ডিফেন্স্ করলাম, এছাড়া কলেজে পড়ানো আর তার সঙ্গে মাঝে মাঝে স্টেটসম্যানে লেখাটাও বজায় রাখলাম। ইতিমধ্যে অরিন্দমও ঢুকলো স্কটিশ কলেজের কেমিস্ট্রিতে আর অবোধ গেলো এক প্রাইভেট কোম্পানির একজিকিউটিভ পোস্টে। আমাদের তিন বন্ধুর কর্মজীবনের প্রথম অঙ্কের শুরুটা ভালই হলো। মা খুব খুশি হয়েছিলেন সবাই কাছাকাছি আছি বলে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে জমিয়ে আড্ডা বসাতাম আমাদের বাড়িতে। শুধু তোমার জায়গাটায় থাকতো শূণ্য, কিন্তু শীঘ্রিই সেটা ভরে উঠবে তার আশায় আমরা দিন গুনতাম। মাঝে মাঝে তোমার দিদা ও বাবার সঙ্গেও দেখা করতাম, ওনারাও খুব খুশি হতেন আমাকে দেখে।

মাসে একটা করে বড় চিঠি তোমাকে পাঠাতাম, ওটাই ছিল তোমার একমাত্র দাবি। প্রতিদানে আমি পেতাম অনেক হালকা চিঠি, ধরেই নিয়েছিলাম বিলেতের কর্মজীবন তো আমাদের মত নয়। তোমার যুক্তিটা ছিল, "মোটেই সেটা নয়। আসল কারণটা হলো তোমার মতো চিঠি কেউ চেষ্টা করলেও লিখতে পারবে না, বুঝলে। এখন বাবার কথাটা মনে পড়ে কেন তোমার লেখা পড়ার জন্যে বাবা অপেক্ষা করে থাকে। কাজেই বুঝতে পারছো দোষটা আমার একার নয়।" তোমার পি এচ্ ডির ডিফেন্স্ করার পর খুব খুশি হয়ে খবরটা জানিয়েছিলে। ঐ চিঠিতেই শেষে লিখেছিলে, "তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। কথাটা কিন্তু শুধু তোমার জন্যে। দিল্লি থেকে লন্ডনে আসার পর ভীষণ একা লাগতো। সত্যি করে বলতে তোমার উপর একটু অভিমানও তখন ছিল। তখন একটা ভারতীয় ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। বছর খানেক বেশ মিশেছিলাম। আমি জানি দিদা, বাবা আর তুমি আমাকে খুব বিশ্বাস করো। জানিনা মিশে ভুল করেছিলাম কিনা, কিন্তু তোমাকে আমি সমস্ত জানাতে চাই। তবে এইটুকু বলতে পারি যে দোষ বা অন্যায় কিছু করিনি যাতে তুমি বা তোমরা কেউ বিন্দুমাত্র আঘাত পাবে।" বিশেষ কিছু মনে হয়নি কথাটা জেনে, কিন্তু একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম তোমার চিঠির শেষ অংশটা পড়ে। তাতে তুমি লিখেছিলে, "এবার তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি, জানিনা তুমি কিভাবে সেটা নেবে। কালই বাবা আর দিদার সাথে ফোনে কথা হয়েছে, কিন্তু ওদেরও খবরটা জানাতে পারিনি। আমি একটা ভাল ইনটারন্যাশানাল স্কলারশিপ্ পেয়েছি - মিনিমাম্ এক, ম্যাক্সিমাম্ দুবছরের জন্যে। যদি নিই তাহলে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি যেতে হবে। তোমরা যদি হ্যাঁ বলো তাহলেই নেবো। রাজকুমার, এই সিদ্ধান্তটা পুরোপরি তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি - তুমি যেটা বলবে সেটাই ফাইনাল, সত্যি, সত্যি, সত্যি।" ওই প্রথম তোমার জন্যে বিপদে পড়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বাড়ি গিয়ে কথাটা পাড়লাম, কিছুতেই তোমার বাবা কিংবা দিদা রাজি হবেন না। শেষে অনেক বুঝিয়ে, ওনাদের রাজি করিয়ে রাতে বাড়ি ফিরেছিলাম।

তখন মাত্র পঁচিশ বছর বয়স আমাদের, ভেবেছিলাম খুব বেশি হলে দুটো বছর, দেখতে দেখতে তুমি এসে পড়বে। তাছাড়া তোমার দিদা আর বাবার কথা ভেবে নিজে একটু শক্ত হয়েছিলাম। তোমার নতুন জিনিস জানার আর শেখার প্রবণতার কথা ভেবেই সেদিন তোমাকে বাধা দিইনি। তাই তোমাকে লিখেছিলাম আমাদের কথা বেশি ভেবো না, তুমি নতুন দেশে সাবধানে থেকো। আমরা এখানে সবাই মিলে তোমার ফিরে আসার দিন গুনবো। তোমাকে যেটা লিখিনি সেটা ছিল 'মন নাহি ছেড়ে দিতে চাই, তবু ছেড়ে দিতে হয়'। তোমার ছোট্ট চিঠি গুলোর সঙ্গে থাকতো তোমার হাতে তোলা অনেক ছবি। সেই ছবি দেখেই পৃথিবীর দুটো বড় শহর লন্ডন আর নিউ ইয়র্কের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তোমার চোখে দেখা নতুন দেশের শহরগুলোকে আমরাও একটু একটু করে ভালবেসে ফেলেছিলাম। সত্যি কথা বলতে একটু হিংসেও হতো ওই শহরগুলোর উপর - অল্প সময়ের জন্যে হলেও ওদের ভালবাসা দিয়ে তোমাকে তো আটকে রাখতে পেরেছে ওরা।

সব কিছুই ঠিক মতো চলছিল, হঠাৎ কিরকম যেন জীবনটা ওলটপালট হয়ে গেলো। মায়ের কথাটা তোমাকে একটু জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম, নাহলে পরে জেনে তুমি হয়ত অভিমান করতে। এই বছরের জানুয়ারির তিরিশ তারিখে, রাত্রিবেলায় মা বলল যে মায়ের শরীরটা নাকি ভাল লাগছে না। মায়ের হাঁটাটা একটু দুর্বল ছিল, সেদিন বলল

হয়তো গ্যাস থেকে বুকে ব্যাথা হচ্ছে। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি মায়ের ঠাকুর ঘরটা অন্ধকার। ঘরে গিয়ে দেখি মা তখনও শুয়ে আছে, গায়ে হাত দিয়েই বুঝেছিলাম জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিসটা সেদিন হারিয়েছিলাম। জীবনেতো কখন কোন কর্তব্য করিনি, তাই জানতাম না তখন কি করবো বা কি করা উচিত। অরিন্দম, অবোধ আর তোমার বাবা দাঁড়িয়ে থেকে মায়ের সমস্ত কাজ সারাতে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। খুব ছোটবেলায় মা বিধবা হয়েছিল, অথচ মায়ের সিঁদুর কৌটটা যদি দেখো মনে হবে মা যেন প্রতিদিন সিঁদুর পরতো। আসলে প্রতিদিন সকালে মায়ের ঠাকুরদের আর ঠাকুমার ছবিতে খুব যত্ন করে মা সিঁদুর পরাতো। একদিন বলেছিল, "শোন, আমি যখন থাকবো না, তুই আর তোর বৌ একটা কাজ করবি। তোরা তো রোজ পারবি না, মাসে একদিন পূর্ণিমাতে সব ছবিতে সিঁদুর পরিয়ে দিবি। দেখিস আমার ছবিতে আবার সিঁদুর পরাস না।" মায়ের কথা মতো ঐ একটা কাজ করি নিয়ম মাফিক। তবে মায়ের নিয়মের গন্ডীর বাইরে গিয়ে যে কাজটা করি, জানিনা সেটা অন্যায় কিনা। বিয়ের ঠিক পরেই মায়ের একটা ঘোমটা দেয়া ছবি ওই ঘরে রেখেছি। প্রতি মাসে যখন সব ছবিতে সিঁদুর পরাই মায়ের সিঁথিতেও খুব চওড়া করে সিঁদুর পরিয়ে দি।

মাকে ছেড়ে ভীষণ একা হয়ে পড়েছিলাম। রাতে ফিরে খেতে গেলে মনে হতো মা কেন পাশে আসছে না। সেই থেকে বাড়িতে রাতের খাবারের পাট চুকিয়ে দিয়েছি। আমার জীবনে সব কিছুতেই ছিল মায়ের অবদান, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না মাকে ছেড়ে কিভাবে থাকবো। বাবা যখন মারা যান মা তখন বেথুন স্কুলে টিচারি করে। মাকে তখন অনেকে বলেছিলেন আমাকে আর দাদাকে নিয়ে বলাগড়ে দেশের বাড়িতে চলে যেতে। আমাদের পড়াশোনার কথা ভেবে মা ঠিক করেছিল মানিকতলার বাড়িতেই থাকবে। বাবার লাইফ ইনসিওরএন্স, মায়ের চাকরি আর বলাগড়ের জায়গা জমি থেকে মা যা পেয়েছিল, তাতে আমাদের কোনো অভাব হয়নি। দাদা আই আই টি থেকে পাশ করেছিল, আমি চিরকাল রইলাম মায়ের কাছে কলকাতায়। দাদা এখন বোম্বেতে থাকে, খুব বড় চাকরি করে। বছরে বার দুয়েক কলকাতায় আসে বৌদি আর ওদের দুটো বাচ্চাকে নিয়ে। শ্বশুর বাড়িতেই ওঠে, আমি একদিন ওদের সময় মত গিয়ে দেখা করে আসি। এছাড়া বছরে দুবার করে এখনও বলাগড়ে দেশের বাড়িতে যায়। ওখানে আছে এক খুড়তুতো ভাই, তার বৌ আর ওদের একটা মিষ্টি ছেলে আকাশ, গেলে ভীষণ যত্ন করে। তাছাড়া গ্রামের চারিদিকে পুকুর, দিঘি, গঙ্গা, সবুজ গাছ, ধানের ক্ষেত, আর পুরনো দিনের নানান কারুকার্য্য করা মিত্তির বাড়িদের মন্দির ও মন্ডপ দেখে মনটা ভরাই। যেটুকু সাহিত্য চর্চা বজায় রেখেছি তার মূলধন জোগাড় করি। দেশের কিছু পুরনো বন্ধুদের সাথে আড্ডা দি - বলতে পারো কলেজ, পড়ানো, কলকাতার ধুলো আর ধুঁয়ো থেকে কিছুদিনের জন্যে মুক্তি নিই। মায়ের কথা কটা দিনের জন্যে মন থেকে একটু সরিয়ে রাখি, মানে রাখতে চেষ্টা করি।

গতকাল তোমাদের ওখানকার ফেডারেল এক্সপ্রেস্ মারফত তোমার পাঠানো ভারি খামটা পেয়ে একটু অবাক লেগেছিল। ভেবেছিলাম নিশ্চয় ওতে আছে তোমার তোলা অনেক ছবি আর হয়ত কিছু শক্ত হোম-ওয়ার্ক। কিন্তু তোমার চিঠিটা পড়ে খুব অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তোমার কথা ভেবে। গত দুসপ্তাহে একের পর এক ঝড় বয়ে গেছে তোমার উপর দিয়ে যা তুমি মুখ বুজে একা সহ্য করেছো। সাধারণ চেক আপ করতে গিয়ে ডাক্তারের সন্দেহ হয়েছিল তোমার বাঁদিকের ব্রেস্টে একটা ছোট টিউমার। তারপর শুরু হয়েছিল একের পর এক বিভিন্ন পরীক্ষা। লিখেছো প্রচন্ড ভয় পেয়েছিলে, এই প্রথম তুমি উপলব্ধি করেছিলে তোমার পাশে আমরা কেউ নেই। একবার মনে হয়েছিল কেন জানাওনি আমাদের, পরে ভেবে দেখলাম আমরাতো কিছুই করতে পারতাম না এত দূর থেকে। যা কিছু দরকার সবই করা হয়েছে, তবু আমরা থাকলে তোমার মানসিক কষ্টের বোঝাটা একটু হালকা করতে পারতাম। কাল রাতে মায়ের ঠাকুর ঘরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম, চোখ দুটো বন্ধ করে মনে মনে মাকে বলছিলাম তোমার কথা।

আজ সকালেই তোমার পাঠানো সমস্ত রিপোটগুলো নিয়ে এন্টালীতে আমার মাসতুতো দাদার কাছে গেছিলাম। তোমার নিশ্চয় মনে আছে বিষ্ণুদা আর ছোটবৌদিকে? উনি এখন বেশ নামকরা ডাক্তার তাছাড়া সল্টলেকে একটা ক্যানসার সেন্টার খোলার ব্যাপারে খুব চেষ্টা করছেন। সমস্ত রিপোটগুলো খুব ভাল করে পড়লেন কয়েকবার। তারপর আমাকে পড়ে শোনালেন রিপোটের শেষটুকু, 'এ গ্রোথ মেড আপ অফ নরমাল সেলস্ দ্যাট হ্যাভ নো সাইন অফ ক্যানসার'। আরও আশ্বস্ত হলাম বিষ্ণুদার কথায়, "এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেহেতু শকুন্তলার মায়ের কথা ডাক্তাররা জেনেছে সেহেতু সমস্ত ধরণের পরীক্ষা করেছে।" ছোটবৌদি সকালের সব কাজ ফেলে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোন কুমারসাহেব, একদম চিন্তা করবে না। তোমরা মেমসাহেবকে একবার নিয়ে আসো দেশে, তারপর ওকে কিভাবে আটকাতে হয় সেটা আমাদের দায়িত্ব।" ঐ প্রথম মনে একটু জোর পেলাম, ভাবলাম তোমার বাবাকে একবার জানিয়ে আসি।

তোমার বাবার কাছে গিয়েই বুঝতে পারলাম উনি সকাল থেকেই আমাকে খুঁজছিলেন। গতকাল রাতে তোমাদের ফোনে কথাও হয়েছে, তবু ওনাকে খুব চঞ্চল লাগছিল। তোমার দিদাকে জানাননি, আমিও সেটাই আন্দাজ করে তোমার বাবার কাছেই সোজা গেছিলাম। তখন আমি বিষ্ণুদার সমস্ত কথা বলে রিপোটের ঐ অংশটা দেখালাম। উনি বহুবার রিপোটটা পড়লেন। তারপর যখন চশমাটা রেখে আমার দিকে তাকালেন, দেখলাম ওনার দুচোখ ভরা জল। বললেন, "দেখো, ভগবান তাহলে আমাদের মনের কথা শুনেছেন। চুমকির দিদা, আমি আর তুমি জীবনে তো কোন পাপ করিনি কিংবা কাউকে মনে আঘাত দিইনি, অথচ আমরা কত আঘাত পেয়েছি। তাই ভগবান হয়ত আমাদের করুণা করলেন। চুমকির মা প্রতি মাসে নিয়ম করে কালিঘাটে যেতেন। ওর মা মারা যাবার পরে আমি আর কোনদিন কালিঘাটে যাইনি। তা চল না আমরা দুজনে কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে চুমকির মায়ের হয়ে চুমকির জন্যে পূজো দিয়ে আসি।"

কালিঘাট থেকে ফিরে তোমার বাবা অনেক জায়গায় ফোন করেলেন। দুসপ্তাহের আগে কোন টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না এখান থেকে। কাল আমরা সবাই দেখবো যদি কোনভাবে তাড়াতাড়ি একটা টিকিট জোগাড় করা যায়। তোমার বাবা বললেন, "জানো রাজকুমার, ওর মা মারা যাবার দিন একটা হাত আমার হাতে আর একটা হাত চুমকির দিদার হাতে রেখে বলেছিল আমরা যেন আমাদের মনের মতো একটি সুন্দর শিক্ষিত ছেলের সাথে ওর বিয়ে দি। চুমকির মা বেঁচে থাকলে আমাদের পছন্দ করা পাত্রকে ও মনের মতো করে বরণ করে ঘরে তুলতো, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজ চুমকির মায়ের কথা ভীষণ মনে পড়ছে। ও মারা যাবার পর কোনদিন চুমকির মনে আঘাত দিইনি, ভুলেও কোনদিন একটাও শক্ত কথা বলিনি যাতে মেয়েটা আমার কোন রকম কষ্ট পায়। কিন্তু তোমাকে এখন একটু শক্ত হতে হবে। যদি দরকার হয় তাহলে একটু কঠিন ভাবে লিখে দিও যে একটা মাস নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ও যেন এখানে ফিরে আসে।"

বাড়ি ফেরার পথে ভাবছিলাম তোমাকে কি লিখবো চিঠিতে। কঠিন কিছু বলার অবকাশ তো তুমি কোনদিন দাওনি, তাই দায়িত্বটা মাথায় নিয়ে একটু চিন্তায় পড়েছিলাম। তারপর মনে হলো রবি ঠাকুরের ভাষায় যা কিছু সত্যি তাইতো কঠিন। তাই অনেক ভেবে তোমাকে একটা সত্যি কথা লিখছি - আমার মনের কথা। আমার মায়ের সাধের সিঁদুর কৌটটা তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমার জীবনের একমাত্র দায়িত্ব থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। যেহেতু চিঠিতে লিখেছো এবার আমাকে চিঠি লেখার হাত থেকে তুমি মুক্তি দিলে, তাই তোমার মতো আন্ডারলাইন করে লিখছি যে এটাই আমাদের শেষ চিঠি। এবার তোমার যা কিছু শোনার তা তোমাকে কাছে পেয়ে বলবো। আশা করবো এই চিঠিটা যেন তোমাকে ওদেশে বেশিদিন পড়তে না হয়। আমরা সবাই তোমার অপেক্ষায় থাকবো, দমদমে নেবেই দেখতে পাবে আমাদের। সবাই তোমায় বরণ করে নেবে ওদের ভালবাসা, শুভেচ্ছা আর আশীবাদ দিয়ে; শুরু হবে আমাদের নতুন জীবন। সত্য সুন্দর হয়ে উঠবে সেই জীবন আর পরিপূর্ণ হবে তোমার আর আমার কঠিন মন-বাসনার। এখানেই শেষ করছি। তুমি আমার ভালবাসা নিও।

২রা মে, ১৯৮৬
কলকাতা

ইতি -
তোমার রাজকুমার

[পরম পূজনীয়া মা এবং কলকাতার ৫৯ সিমলা রোডের মাসিমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে]

Travel

From Beijing with Love

Pradipta Chatterji

Traveling to a foreign country is always a great opportunity to see new and wonderful things, but what makes foreign travel especially worthwhile for me is getting to know new people .The following is a narrative of our recent visit to Beijing, China and a description of some of the exceptional people we came across. I hope you will enjoy getting to knowing them as much as we did.

Beijing is a very ancient city, yet also very modern and upcoming. In its 3000 years of history, Beijing has been the capital of many imperial dynasties. It has been the capital of the People's Republic of China since 1949.Beijing is a composite of two Chinese characters that mean "north" and "capital".

One World One Dream

We landed at the Beijing International airport about a week before the starting of the 2008 Olympics, the first time this event has been held in China. We actually had not come here for the Olympics, but rather for my husband's academic workshops, and our visit here was to last for three or four days. We were initially a little concerned whether the impending Olympics 2008 was going to disrupt our travel. However, after landing we felt so much excitement in the air regarding the Olympics and it was actually quite infectious.

The first Olympics were played in the valley of Olympia in southwest Greece in 996 BC. After numerous setbacks and several hundred years, the first modern Olympics started in Athens in 1896. Beijing had been preparing for this exceptional endeavor with enthusiasm and dedication and was more than ready to welcome athletes from all around the world by the time we arrived.

Several projects were undertaken here to launch this great event. The new International Airport was said to be the largest construction project on earth and the design resembling a soaring dragon in red and yellow. The airport was enormous, well lighted (a bit excessive perhaps), and resplendently clean. It was also very crowded. After we walked down a sloped walkway with our luggage in the carts (by some means we always seem to collect a lot of luggage) we were greeted by a young woman and a middle aged man. They were from the Central University of Finance and Economics in Beijing.

The attractive young woman (who looked like a teenager) turned out to be a post doctoral fellow at this institute. The man was the driver of the car they had brought for us. The woman did have a beautiful name which I do not remember because it sounded difficult. I wanted to write down her name, but was unable to open my pocketbook to retrieve a piece of paper as everyone was moving so fast and I didn't want to lag behind in the thick crowd.

Olympic Mascots

Once out of the airport we got into the midday traffic in the air-conditioned car they had brought. We were surrounded by cars everywhere and there were a few buses here and there trying to slowly maneuver their gigantic bodies through the traffic. Very few cars were allowing them to do so. Out of the window we could not see much except numerous skyscrapers, while the sky was barely seen. Currently, air pollution indeed is a serious problem in Beijing. However, when you look outside the air did not appear polluted as everything was shinning with new grandeur and glimmer in the bright daylight without a bit of imperfection. There were posters and signs all over the high buildings, written in English and Chinese welcoming everyone to the Olympic Games (with their logo: One World One Dream), and pictures of the Olympic mascots. As we drove through the roads which were also shiny and sparkling, we saw all the designer brand names on the towering buildings. The ride continued for quite some time.

The hotel felt like heaven, away from the heat and hustle of the city and sleep never felt so welcoming in the soft milky white extra big pillows and comforters in the cold room.

The next morning we met Chen, a 23 year old student from the Central University of Beijing, who is working on his masters. Like most others of his age group (globally) these days, Chen is ambitious, hopes to pass the GRE to earn an advanced foreign degree in his field and settle down with a fulfilling job somewhere near his home town. Chen also informed us within a few minutes of our encounter that he comes from 'a very poor family' and that they lived in a village near Beijing. Chen's dad is a farmer; Chen has a brother and a sister who are attending high school. Chen was worried about the future of his siblings as he

wanted them to obtain advanced degrees and sustained high hopes for their future, but had no money to help make that possible.

My guide books said that in China it is not uncommon to ask questions to strangers that are personal (e.g. age, marital status, occupation, and so on). Surprisingly Chen gave out a lot of information about himself within a few minutes but did not ask us any questions. I was too tired from the jet lag to volunteer any personal information and I needed time to warm up anyway.

Chen was bursting with enthusiasm to guide us for sight seeing through Beijing. It was midday and the temperature was over ninety degrees. The sight seeing was to involve a lot of walking in this heat. We got into our rented hotel car and everyone agreed that first we must see the National Olympic Stadium. This was to be the centerpiece of the Olympics and the new stadium was to be the world's biggest enclosed space, capable of holding 100,000 spectators, designed by Swiss architects and resembling a giant bird's nest. This was to be the venue for the opening and closing ceremonies and several other contests.

Next to the Bird's Nest was the National Aquatics Center to stage the Olympic swimming and diving events. Here the water cube is the natural formation of soap bubbles (another innovative design) resulted from the research of some professors in Ireland. As we looked around, we saw many tourists excitedly taking pictures of themselves with the above buildings in the backgrounds. I wanted to go back to our car because the heat was becoming oppressive, but Chen appeared disappointed. I was so tired with jetlag coupled with the fast pace of our sight seeing that my feelings were not responsive to the enthusiasm of a 23 year old (we get so self centered !).Inside, the car felt good with the cold air.

No car allowed in shopping area

I did get a bit excited as I remembered from our last visit that there are two markets that are very popular to the tourists in Beijing that sell almost everything, called the Pearl Market and Silk Market. Chen did not appear to be interested as I proposed to visit one of the markets but reluctantly agreed to visit the Silk Market. The Chinese name of this market is Xiushui. Reportedly 100,000 shoppers a day visit this market and this is the city's third major tourist attraction here after The Forbidden City and The Great Wall.

The Silk Market is fully air-conditioned and four stories high. It is also infamous as many of the goods and items are supposedly counterfeits. With proper bargaining the prices can be very low. Although we had very little space to spare in our luggage the temptations were unbearable. However Chen seemed determined to prevent me from buying anything. It was difficult to understand whether he didn't want us to spend more than such goods were worth or his pride was hurt seeing foreigners purchasing fake items from his country. At one point he was outright upset as I bargained to pay $5.00 US dollar for a leather purse (the original price was $ 50.00). He kept on repeating "You must not state such a high price when you bargain". I did not buy that purse.

Next stop was Tiananmen Square and the Forbidden City. I had visited China twice before and in one of the visits during Easter break I had seen Beijing (and some outskirts including the Great Wall). The weather was tolerable at that time for the walking but was not on this day. However it was impossible to explain all of this to Chen and make him understand our difficulties.

The Tiananmen Guangchang (The Square of the Gate of Heavenly Peace) happens to be the world's largest public square. Ironically, most of us first remember its association with the bloody climax of 1989's pro democracy movements. It is also the final resting place of the chairman Mao Zedong. Mao's Mausoleum is an imposing hall at the center of the square, in which lies the embalmed body of Mao (who died in 1976) enclosed in a crystal cascade and draped in a red flag. Mao proclaimed the founding of the People's Republic of China on October 1 in 1949 from this massive Ming-Dynasty gate where his huge portrait still hangs. The way to the Forbidden City is from here.

The Forbidden City is so called because at one time only members of the imperial court were allowed inside. This magnificent complex is a grand monument to the 24 emperors who ruled from its halls over a period of 500 years. Successive imperial dynasties had ruled here since the 15th century. The last of the emperors were forced to abdicate at the beginning of 20th century and the public were finally admitted through the palace gates in 1949. These are one of the largest and greatest palace complexes ever built.

The Square is surrounded by several cultural and political institutions. The China National Museum stands on the eastern side of the Square. This building combines the Museum of Chinese History and the Museum of the Revolution. The exhibits vary from top quality Chinese artistic masterpieces to unimpressive propaganda. The Great Hall of the People is a monolithic structure towering in the western side of the Squire. The Great Hall is the seat of the Chinese Legislature. There is a vast auditorium and banquet halls which can be visited when the People's Congress is not in session.

As we walk through the Squire we saw thousands of visitors from all over the globe, and many kite flyers. All the walking now made Chen hungry, which was a little problem since we were trying to cut down calories (unsuccessfully).We ate a 108 course brunch at our hotel this morning including varieties of Chinese, Indian and Western Cuisines.

Inside McDonalds

Chen started to announce that he was very hungry and would like to go to McDonalds (at the next street). He mentioned had never been there as only rich people go there (according to Chen) or at least KFC. It was difficult for a young person in China to comprehend why we wanted to avoid fast food places. McDonalds, KFC and similar fast food presently are extremely popular places and very crowded with all kinds of nicely dressed people (many of them appeared as tourists from other Asian countries).

We entered the crowded McDonald and faced a different kind of problem, Chen would not only not allow us to pay for his lunch at McDonalds, but kept on insisting to pay for our lunch since we were the guests. Telling him that we were many years older than him did not help because that did not invalidate our status as guests. So I had to come up with another effective strategy in 30 seconds since we are at the cashiers place about to pay for our food. I had to use the age old tactic that I knew was going to work. I just couldn't tolerate Chen spending so much of his money on us.

I quietly told him that in this case he had no choice since he was like our son as we do have a son who is a few years older than him. Chen was silent for a few moments and allowed us to pay. The strategy worked wonderfully but opened up room for personal questions. Chen asked whether our son liked McDonalds also, I had to say yes (not a complete lie as our son did used to like McDonalds very much when he was little, before we all became so health conscious). Next, Chen asked if our son was married. This answer was no and the complete truth. Chen was surprised and said that he would definitely be married in a few years since he had a girlfriend for last four years. Chen considered her to be a fantastic young lady. Of course, she is attractive and smart but what made her so special was that every weekend she called Chen's parents to check on them since Chen is so busy with his studies and exams that he sometimes did not get chance to call his parents regularly. Now I felt that it was time for me to open up, and I showed him the photos of our precious grandchildren two handsome little boys and two granddaughters (I did not have the picture of the third granddaughter with us).

I also shared with him the information that the girls are half Chinese. I doubted before how much Chen understood but I wanted to share this information with him. I tried to explain but was not sure how much a young man who had never been out of China would understand the complexities of our culture. Our son in law's great grandfather came to California and through generations and some intermarriages with Americans they have adopted the American ways and culture much more than Indians do in one or two generations.

There are also political circumstances under which the Chinese might had left their homeland which they had declined to discuss with their children and grand children. These are sensitive issues. I wanted to be open like Chen but I had to be a bit guarded to protect feelings. The whole narrative must had been perplexing to Chen. Chen looked at me with blank eyes but did not ask any more questions.

We had fish fillets sandwiches which tasted the same as they do here. Chen had chicken nuggets, fries and coke. As he mentioned, this was Chen's first time to the McDonalds he said that he loved it and thanked us profusely. We also thanked him for being our guide and being so patient with our whims. He kept on saying 'my pleasure', 'my pleasure'.

We next went to a street almost next to the Tiananmen Square. This was a wide street lined by shops old and new. Chen informed us we can safely shop here since all the items were originals, unlike my favorite Silk Market. We entered a shop, the set up of the store and the merchandise did not appear to me any different from the Silk Market. Inside of all the shops were subdivided into several sections, like shops within shop, with each section was headed by a salesperson. The problem was that once we inquired about an item regarding its price or anything, the salesperson assumed that we were going to buy that item and would not leave us alone until we got it. Although Chen said that no bargaining is possible in these original shops (with goods looking just like the infamous silk market), we did some bargaining and shopped a bit through the crowded alleys.

Dinner was supposed to be with Chen's professor, his family and other important guests from the university. Chen's professor (my husband's friend and colleague who occupies a prestigious position at the university) did not appear to me to be much older than Chen. We also met his pretty wife and nine year old son.

Dinner was served in two separate rooms at the restaurant. We were with the professor's family. Countless number of dishes, each with its own set of chopsticks to serve started to arrive on the spinner attached to the top of the table so guests can spin and reach the dishes of their choice. However the table suddenly appeared to spin violently and no it was not earthquake. The nine year boy started to spin the table rapidly to serve himself whichever dishes he desired, digging his own chopsticks into the dishes and eating whatever he wanted before anyone got a chance to sit down. Interestingly no one said any thing to the boy for this behavior, only his mother kept on throwing glances at him while smiling sweetly from the other side of the table.

As we started to eat more dishes came, including some very tasty dumplings straight from the oven. The young boy speedily bit into one and of

course burned his tongue. He screamed and spat it out on his plate and dashed towards the door, possibly in search of ice or water to cool his mouth. Endless varieties of dishes continued to come. At the same moment the waitress was about to enter with a huge pot of boiling broth in her hand. The boy clashed into her, and I closed my eyes expecting a horrible scene to occur. After a few seconds when I dared to open my eyes everything appeared normal. The waitress managed to maintain her balance by kneeling down and placing the pot on the floor saving the boy and herself. She did not appear that much older than the boy. The boy left and interestingly nobody seemed to be bothered with this incident. The mother was chatting with someone with a sweet smile probably hadn't noticed anyway.

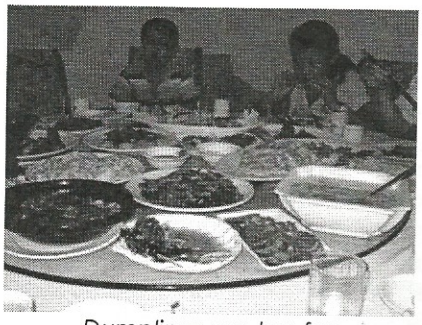

Dumplings are too far

We had a great time talking about all sorts of things, and of course I displayed the precious photos of the granddaughters, (we only carried the photos of two of the children and told them that there was another but we didn't carry her picture since she was too young to get pictures taken at school). We explained their heritage, and no one said anything. Probably the matter was too complicated to explain to the Chinese in their homeland.

After dinner ended we said goodbye to every one. The nine year old boy reappeared from nowhere, very politely shook our hands, and spoke to us in perfect English saying his interests in school were Math and Astronomy, and we left to pack since the next morning we were to leave.

Our flight was in mid morning and I was a bit annoyed when I heard that Chen was coming to accompany us to the airport. After all, we had said goodbye and exchanged emails last night, and now we needed to get organized within a short time. Beijing traffic was very bad and this was rush hour. I did not understand any purpose for Chen to take a bus from where he lives to come to our hotel , just to go to the airport and go all the way back again. Our luggage was excessively large and bulky and it was good to have some extra time.

The other days when we went sight seeing Chen always showed up earlier than he said but this morning he was late. I almost persuaded my husband to call for the hotel taxi, Chen appeared from nowhere, he was not alone there was the professor behind him, and their hands were full of gift packages. I absolutely had no room in my luggage to take anything, and we were running late.

They started opening their gifts for us. The first one was a beautiful Jade centerpiece (I looked at it in the shop but didn't buy it while Chen was with us), next came silk scarves and ties, yellow Jade jewelry, and Jade candle holders. We didn't know what to say. The last gift bag held three little Jade pendants of three different colors with strings instead of chains (for little girls to wear) and a huge cloth mascot doll.

The young professor said with a smile that he knew we were late and he had brought a car with driver to take us to the airport on time. He was late because they needed to wait for the shops to open. He also said, "We couldn't let you leave without sending ur love to your granddaughters from the country their forefathers came from many years ago, and we hope maybe some day they will come to see this country.

Chen was standing behind him, beaming.

Find Us Online

You can find us online at **http://binghamtonpuja.webs.com**

We will be uploading our pictures and videos in the website after our Puja.

Please check our website and download them to enrich your memories.

You can also find our future activities in the website.

আঁকিবুকি

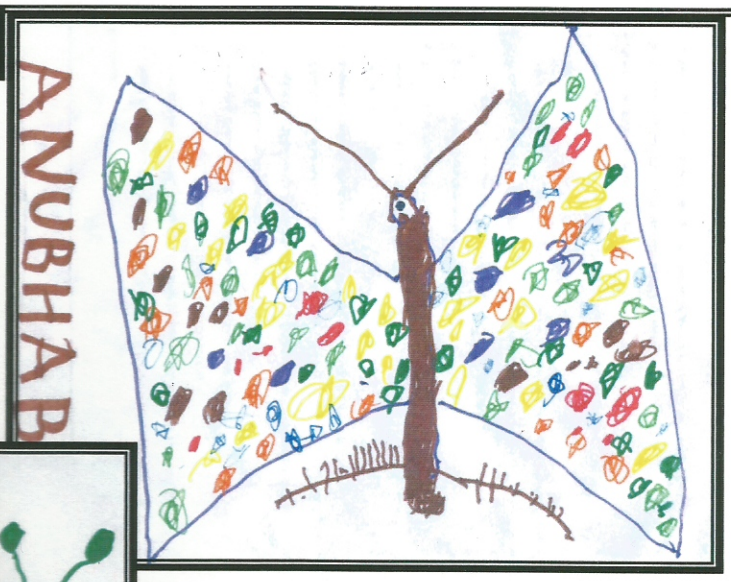

Drawings by Anubhab Das

পুনরাগমনায় চ

ভাসান শেষে যুক্তকরে,
আঁখির জলে হৃদয় ভরে,
বলি মাগো আবার করে,
এসো যেন আমার ঘরে।
শষ্য এনো, শক্তি এনো,
শান্তি দিয়ো সবার প্রাণে,
অন্ধকার এখনো বাকি,
আলো এনো মা মানবমনে।

- বিপ্লব রায়

Greater Binghamton Bengali Association cordially requests the patrons to continue their overwhelming support not only in the Sarbojonin Durgotsav but also in all other cultural activities in the coming months. May the essence of togetherness prevail in the future. We also pray for a healthy, wealthy and satisfactory future for you.

পূজা নির্ঘন্ট

তারিখঃ ইং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৮/ বাং ১০ই আশ্বিন, ১৪১৫
দেবীর গজে আগমন, দোলায় গমন

প্রাতঃ	ঃ ০৮-৩০ ঘটিকায় আমন্ত্রণ, অধিবাস, ষষ্ঠী পূজা
প্রাতঃ	ঃ ০৯-৩০ ঘটিকায় সপ্তমী পূজা, নবপত্রিকা পূজা
দ্বিপ্রহর	ঃ ১০-৪৫ ঘটিকায় অষ্টমী পূজা, সন্ধি পূজা
দ্বিপ্রহর	ঃ ১২-৩০ ঘটিকায় পুষ্পাঞ্জলি
দ্বিপ্রহর	ঃ ১২-৪৫ ঘটিকায় ভোজন অবকাশ
দ্বিপ্রহর	ঃ ২-০০ ঘটিকায় নবমী পূজা, দশমী পূজা
দ্বিপ্রহর	ঃ ৩-০০ ঘটিকায় পুষ্পাঞ্জলি
দ্বিপ্রহর	ঃ ০৩-১৫ ঘটিকায় ঘট বিসর্জন, প্রদক্ষিণা, সিঁদুর উৎসব, বিজয়া

Puja Schedule

Date: 27th September, 2008

08:30 AM	:	Amantran, Adhibash, Sashthi Puja
09:30 AM	:	Saptami Puja, Nabapatrika Puja
10:45 AM	:	Astami Puja, Sandhi Puja
12:30 PM	:	Puspanjali
12:45 PM	:	Lunch
02:00 PM	:	Nabami Puja
03:00 PM	:	Pushpanjali
03:15 PM	:	Ghata Bishrarjan, Pradakhkhina, Sindur Utsab, Bijoya

DO NOT FORGET TO TAKE PART IN OUR FOLLOWING ACTIVITIES

Cultural Program : 5:00 PM -8:00 PM
Sit & Draw (for Kids) : 2:00 PM –3:00 PM
Science for Fun (for Kids) : 11:00 AM – 12:00 NOON
Dinner : 8:30 PM Onwards